MAY 1988

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : ভারতীয় ডাকটিকিটে বিজ্ঞানী

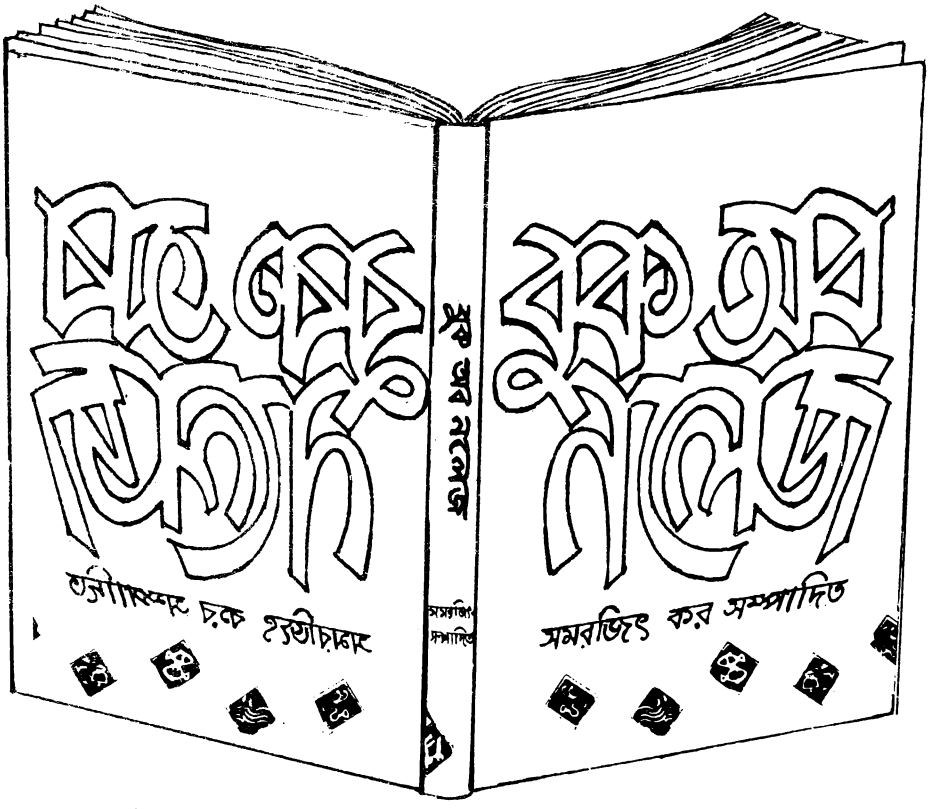

দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

'অণু' শব্দের অর্থ কি ? পরমাণুই বা কাকে বলে ? আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের অজানা নয়। কিন্তু অক্টেন স শব্দটির অর্থ আমরা সবাই জানি কি ? ভিনিগার নানারকম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহার হয়। কিন্তু ভিনিগার যে একরকমের অ্যাসিড এ তথ্য আমাদের অনেকেরই অজানা। ম্যাগ্রোমিটার ও ম্যাগোমিটার শব্দদুটি আজকাল আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। কিন্তু শব্দদুটির সঠিক ব্যবহার কি ? বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও অনেক শব্দ আমরা শুনতে পাই—যার প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানি না। এইরকম প্রায় ২৫০০ শব্দের চিত্রসহ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রচনা করেছেন প্রবীণ বিজ্ঞান লেখক অমরনাথ রায়। যে গ্রন্থ শুধু কিশোর কিশোরীদেরই নয়, অনেক বয়স্ক পাঠকেরও কৌতূহল মেটাবে। পঁচিশ টাকা

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
অমরনাথ রায় সঙ্কলিত

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

আপনার ছেলেমেয়েদের
আরও জানার কৌতূহল
মেটাবে

একখণ্ডে সম্পূর্ণ

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস

বুক অব নলেজ

পঞ্চাশ টাকা

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার
৭ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে

অনুষ্ঠান সূচী

অতিথি বরণ

সভাপতি ঃ শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রধান অতিথি ঃ ডঃ অশেষপ্রসাদ মিত্র এফ আর এস

স্বাগত ভাষণ ঃ রবীন বল

প্রদর্শনী

বাংলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও খুদে বিজ্ঞানীদের তৈরি মডেল

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন ডঃ অশেষপ্রসাদ মিত্র

বিজ্ঞান আলোচনা

ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : আগামী দশকে

সূচনা : সমরজিৎ কর

বক্তা ঃ ডঃ অশেষপ্রসাদ মিত্র

সম্মাননা ও পুরস্কার

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার ঃ প্রাপক সংকর্ষণ রায়

রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার ঃ প্রাপক আনন্দ বাগচি

মডেল প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ ও গল্প প্রতিযোগিতা, শব্দকূট, আই কিউ টেস্ট ও ক্যুইজ কনটেস্ট প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্পণ

সভাপতির ভাষণ

তথ্যচিত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সৌজন্যে
"গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য" শীর্ষক তথ্যচিত্র প্রদর্শন

প্রবেশ আমন্ত্রণমূলক

স্থান ঃ মহাবোধি সোসাইটি হল ॥ 4A বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল 73

7 মে, শনিবার, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা

চিঠিপত্র

টি. ভি. কি করে দেখবে

মার্চ মাসের কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে গিরিশ রায় বর্মণের 'জানা অজানা' নামক প্রবন্ধটি 'কি করে টি. ভি দেখবে' পড়লাম এবং খুবই ভাল লাগলো। এবিষয়ে তিনি 5টি পয়েন্ট দিয়েছেন, কিন্তু আমার মনে হয় এই 'জানা অজানা'তে আর দুটি প্রয়োজনীয় পয়েন্ট বাদ গেছে। সেই দুটি নিম্নরূপ—(1) টি. ভি. কখনো বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সময় চালু করা উচিত নয় কারণ এই সময় টি. ভি-র নানা পার্টস্-এর ক্ষতি হতে পারে, এমন কি পুড়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে। টি. ভি চলাকালীন যদি লোডশেডিং হয়ে যায় তবে এই সময় টি. ভি-র সুইচ্‌টা অফ্ করে দেওয়া ভালো। নইলে যে কোন সময়ে কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই দুটি পয়েন্ট প্রবন্ধটিতে জুড়ে দিলে সুন্দর ও সম্পূর্ণ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সুদীপ্ত সেনগুপ্ত, রামপুরহাট, বিবেকানন্দ রোড, জেলা-বীরভূম পিন 731224, ভারতী-ভবন"

DNA ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

DNA-এর সম্বন্ধে আমি কিছু ভুল উক্তি করেছিলাম গত Feb, '88 সংখ্যায়। তার সংশোধনের জন্যে আমি সুদীপ কুমার ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। তার সঙ্গে আরও জানাই যে বেসটির নাম যে থাইমিন হবে থাইসিন নয় সেটা আমিও জানি। সম্ভবতঃ মুদ্রণ প্রমাদ হেতু থাইমিন থাইসিন হয়েছে। আমি ভুল করিনি। আর একটি কথা তিনি বলেছেন, শর্করা না বলে পেণ্টোজ শর্করা বললে আরও বেশ ভাল হত। আমার প্রশ্ন উনি কি আমার চিঠিটা ভালভাবে পড়েছেন? আমি লিখেছি পাঁচটি কার্বন পরমাণুযুক্ত শর্করা, এটা পেণ্টোজ শর্করা নয় কি?

পরের প্রসঙ্গে আসি, মার্চ '88 সংখ্যার বলতে পারো কেন বিভাগে প্রশান্তকুমার ভৌমিক ও অমরের প্রশ্ন 'ব্রোমিন দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করলে কি কি জিনিস উৎপন্ন হয়? এর উত্তরে বলা হয়েছে জারিত হয়ে সালফার ও হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেন নি কোন্ পদার্থ জারিত হয়। বলতে হবে H_2S জারিত হয়ে S উৎপন্ন করে, কারণ আমরা জানি যে যৌগিক পদার্থ থেকে হাইড্রোজেন বা তড়িৎ-ধনাত্মক পদার্থ অপসারিত হয় সেই যৌগিক পদার্থ জারিত হয়, অপর-পক্ষে Br_2 বিজারিত হয়ে HBr উৎপন্ন করে।

সুব্রত কুমার ভাস্কর 169/A, রেলওয়ে কলোনী, ঝলঝালিয়া, মালদা 732102।

আবিষ্কারের গল্প

মার্চ 1988-এর কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকায় 'আবিষ্কারের গল্প' —এই পাতায় 'সেলাই-কল'-এর আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে। এখানে আবিষ্কারকের নাম বলা হয়েছে 'ইলিয়েস হাও'। অথচ এই 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার June 1984-এর সংখ্যায় 'সেলাইকল' আবিষ্কার নিয়ে শ্রী মনোজ কুমার দাস-এর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি 'সেলাই-কল-এর আবিষ্কারকের নাম লিখেছেন 'ইলিয়াস হাও'। আবিষ্কার করেন 1842 সালে।

এরপর 'জানবার কথা' নামক একটি বইয়ে আমি পেয়েছি 'সেলাই কর-এর আবিষ্কারকের নাম 'থিমোনিয়ার' (ফ্রান্স) খ্রীস্টাব্দ 1830।

এখন আমার প্রশ্ন হল 'সেলাই-কল' এর আসল আবিষ্কারক কে? তিনি কত খ্রীস্টাব্দে এই কল আবিষ্কার করেন?

অনুপম ভৌমিক, 6/32 নিউটন এভেনিউ জেঃ—বর্ধমান-713205। দুর্গাপুর—5

বলতে পারো কেন

আমি 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে'র একজন নিয়মিত পাঠক। এর 'বলতে পারো কেন?' বিভাগটি আমার খুবই প্রিয়। গত মার্চ '88 সংখ্যায় 'বলতে পারো কেন?' বিভাগের উত্তরে কতকগুলি ত্রুটি ও অস্পষ্টতা দেখলাম। এখানে এই পত্র মারফৎ আমি তা কিছুটা সুস্পষ্ট করতে চেষ্টা করছি।

এক ঃ প্রশ্নটি ছিল—বজ্র কী? এবং কিভাবে আকাশ থেকে ছুটে আসে? মীমাংসা—যদিও মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ যথা ultra-violet rays, Cosmic rays ইত্যাদি আয়োনোস্ফিয়ার থেকেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়, তবু অতি সামান্য পরিমাণে ট্রপোস্ফিয়ারেও ঢুকে পড়ে। এই রশ্মিগুলি ঊর্ধ্বাকাশে মেঘের জলীয় বাষ্পবাহী কণাগুলিকে তড়িতাহিত করে। যদি দুই বিপরীত তড়িৎ-বাহী মেঘের মধ্যেও তড়িৎ মোক্ষণ হয় এবং তার আলোক আমরা দেখতে পাই, তবু সাধারণভাবে বজ্রপাত বলতে যা বুঝি তা হল তড়িতাহিত মেঘ ও ভূ-পৃষ্ঠের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ। কারণ, তড়িতাহিত মেঘ ভূ-পৃষ্ঠকে বিপরীত তড়িতে আহিত করতে চেষ্টা করে। যদিও তড়িৎ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
মে ঃ 1988

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ সৌর ঝড় ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ অদৃশ্য প্রাণী ও সেই গ্রহ ॥ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় 31

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ ভারতীয় ডাকটিকিটে বিজ্ঞানী ॥ প্রবীরকুমার লাহা 19

পড়াশোনা ঃ পরমাণু কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস 51

কমপিউটারের কলাকৌশল ঃ মাইক্রো প্রসেসর ॥ সৌম্য মিত্র 29

জীবজন্তু ঃ ছাগল সমাজ ও গায়ের গন্ধ ॥ গীতা মিত্র 53 ঃ আজব প্রাণী ক্যামেলিয়ন ॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ 39

ধারাবাহিক রচনা ঃ বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 47 ঃ রেল গবেষণা ডিজাইন ও স্ট্যাণ্ডার্ডস প্রতিষ্ঠান ॥ বিমান বসু 9 ঃ নীল সাগরে রহস্য ॥ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 35

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের জীবন ও কাজ ঃ একটি তথ্য চিত্র ॥ ধ্রুবজ্যোতি দে 15

গাছপালা ঃ বট ॥ সুব্রত চৌধুরী 28

খেলাধুলা ঃ খেলাধুলার টুকিটাকি ॥ অজয় দাশগুপ্ত 40

জানা-অজানা ঃ দেবব্রত রায় 54 ঃ রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় 54

ফিচার ও ছবিতে গল্প ঃ প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 11 ঃ আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার ও অনিল কর্মকার 12 ঃ খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট 55 ঃ কীটপতঙ্গের কথা ॥ অলয় ঘোষাল 56 ঃ আবিষ্কারের গল্প—বজ্র নিরোধক ॥ অলয় ঘোষাল 58

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র রচনা ঃ ইলেকট্রনিকস্ ক্যুইজ ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 18 ঃ নীল বিদ্রোহ ও কৃত্রিম নীল আবিষ্কার ॥ প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় 27 ঃ রহস্যময়ী পূর্ণশশী ॥ সমীরকুমার ঘোষ 41

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 63 ঃ বিজ্ঞান সমাবেশ ঃ শব্দকূট ॥ শঙ্খপ্রতাপ ভট্টাচার্য 57 ঃ আই কিউ টেস্ট ক্যুইজ কনটেস্ট ও শব্দকূটের সমাধান 57 ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট 55 ঃ বলতে পারো কেন ? ॥ সুধাংশু পাত্র 59 মজাদার ফোয়ারা ॥ অপরাজিত বসু 61 ঃ হাইভেল্টেজ প্রোটেকশন ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র 66 ঃ বিজ্ঞান সমাবেশ 66 ঃ মডেল বানাতে গিয়ে ॥ রাজেশ গিরি 65

প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল ॥ **অন্যান্য ছবি ঃ** অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
লিখবেন
আবদুল্লাহ্ আলমুতী
শক্তির বিকল্প উৎস

প্রধান সম্পাদক ঃ **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক ঃ **রবীন বল**
সহ সম্পাদক ঃ **জয়ন্ত দত্ত**

মোক্ষণ এক সেকেণ্ডেরও ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ কাল স্থায়ী হয়, তবু তার ফলে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং নিকটবর্তী গাছ-পালা ভস্মীভূত হয় বা বাড়িঘর ফেটে যায়। তড়িৎ আহিতের ফলে যে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি হয় তাকে তড়িৎ মোক্ষণ বলে। শব্দসৃষ্টির কারণ হল,—তাপের প্রভাবে বায়ুর প্রসারণ ও পুনরায় চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর চাপে সঙ্কোচন।

দুই: দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল—'Hcl তড়িৎ যোজী না সমযোজী।'

Hcl সমযোজী। যেহেতু, তারা একটি ইলেক্ট্রন জোড় সমভাবে ব্যবহার করে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে বাইরের কক্ষে 2টি ও ক্লোরিনের বাইরের কক্ষে আটটি ইলেট্রন সংখ্যা পূরণ করে। কিন্তু Hcl এর মধ্যে তড়িৎ যোজী যৌগের লক্ষণও দেখা যায়। i) Hcl এর আয়নীয় বিয়োজন জলীয় দ্রবণের মধ্যে ঘটে [$Hcl \rightleftharpoons H^+ + cl^-$], ii) Hcl এর সঙ্গে যে কোন ধাতুর বিক্রিয়ায় ক্লোরাইড যৌগ ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়, iii) Hcl তড়িৎ বিশ্লিষ্ট হয়। এবার ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক:—

বন্ধন (Bond)-এর ইলেক্ট্রন আকর্ষণ ক্ষমতাকে তড়িৎ ঋণাত্মকতা বা Electronagetivity বলে। cl এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা H অপেক্ষা অনেক কম। এখন বন্ধনরূপে দুটি ইলেক্ট্রন ব্যবহার করে ব্যাপারটি বোঝাচ্ছি।

Hcl = (H) o—o (cl)। এখন
↑
ইলেক্ট্রন

cl এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা কম ও Hএর তড়িৎ ঋণাত্মকতা অধিকতর হওয়ায় cl এর ইলেক্ট্রনটি হাইড্রোজেনের দিকে সরে যায়। Hcl = (H) o—o (cl) অর্থাৎ cl এর প্রতি আকর্ষণ জলীয় দ্রবণে কিছুটা শিথিল হয়ে আসে এবং জলীয় দ্রবণে H এর প্রচণ্ড আকর্ষণ ক্ষমতা cl এর ইলেক্ট্রনটি ছিনিয়ে নিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটায়নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এবং cl ইলেক্ট্রন হারিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ঋণাত্মক আয়ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ তড়িৎ যোজী যৌগের ন্যায় ব্যবহার করে।

সন্দীপ রায়, দশম শ্রেণী, বিবেকানন্দ ইন্সিটিটিউশন, হাওড়া-4।

হিল বিক্রিয়া

আমি জনপ্রিয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। ফেব্রু-88 তারিখের চিঠিপত্রে অরবিন্দ বিশ্বাস মহাশয়ের হিল বিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার কিছু মতামত আছে। প্রথমেই বলি ডিসেম্বর '87 সংখ্যার লাইফ সায়েন্স কুইজের লেখকদ্বয় অভ্রান্ত। অরবিন্দ বিশ্বাস মহাশয় সম্পূর্ণ উল্টো কথাটি বলছেন। অক্সিজেন (6_2) নির্গমন প্রক্রিয়াকে উনি হিল বিক্রিয়া বলেছেন। ওনাকে অবগত করার জন্য একাদশ শ্রেণীর নন্দী গুহ ও বর্ধনের বই হতে কিছুটা অংশ তুলে দিলাম:—

"ফোটোলিসিস: সংজ্ঞা—সূর্যালোকের সহায়তায় সক্রিয় ক্লোরোফিল দ্বারা জলের আয়নীকরণ প্রক্রিয়াকে ফোটোলিসিস বলে।

বিজ্ঞানী রোবিন হিল (Robin Hill) 1940 খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম জলের এইরূপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করেন বলিয়া ইহাকে হিল বিক্রিয়া (Hill reactlon) বলে।

সমীকরণ: 2H O + উত্তেজিত ক্লোরোফিল → $2H^+ + 20H^-$ স্বাভাবিক ক্লোরোফিল।"

অরবিন্দ বিশ্বাস মহাশয়ের শেষের প্রশ্নটির ভিত্তিতে উত্তর দিলাম।

'পড়াশোনা' নিয়ে $1 + tanQ = Sec^2Q$ সূত্রটিকে ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে বন্ধুবর পার্থ প্রতিম বিশ্বাস $SecQ = \frac{OB}{OA}$, এবং $tanQ = \frac{AB}{OB}$ লিখেছেন এবং শেষে বলেছেন, সুতরাং $1 - tan^2Q = See^2Q$ কিন্তু তিনি OB. OA, AB কোথা থেকে পেলেন? দশম শ্রেণীর মধ্যশিক্ষ্যার পর্ষদের বই এর 20 পাতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন নিশ্চয়।

আর একটি কথা আবিষ্কারের গল্পে মহৎ বিজ্ঞানীদের কার্টুন ছবি ছাপানো বন্ধ করুন।

শ্রী লক্ষ্মীকান্ত বসু (দশম শ্রেণী) গোবরা, চণ্ডিতলা, হুগলী।

লেখকের প্রতি

আমি আপনার 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' এর একজন নিয়মিত পাঠক। আমি 1988 সালে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। আমি আপনার পত্রিকার (ফেব্রুয়ারী, 1988) সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর ভূগোলের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী থেকে 65% কমন পেয়েছি। এজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ লেখক রমানাথ চক্রবর্তী মহাশয়কেও।

চাঁদু ঘোষ, প্রযত্নে, ট্যামরচন্দ্র ঘোষ, বেলবাড়ী পো: গঙ্গারামপুর জেলা: পশ্চিম দিনাজপুর।

সৌর ঝড়

সমরজিৎ কর

যখন জোরে বাতাস বইতে থাকে, তোমরা বল, ঝড় উঠেছে।

যদি প্রশ্ন করি, বাতাস কী? জানি সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বলে উঠবে, এ আর এমন কি কঠিন প্রশ্ন। বাতাসের প্রধান উপাদান অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস। এ ছাড়াও বাতাসের মধ্যে মিশে থাকে নানান গ্যাস। যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, হিলিয়াম, ক্রিপটন, নিওন, জেনন প্রভৃতি। পরিমাণে এগুলি অবশ্য খুবই নগণ্য। এ ছাড়াও থাকে বৎসামান্য ওজন, নাইট্রোজেনের অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড। বাতাসে জলীয় বাষ্পও থাকে। থাকে ধূলিকণা। এ সব নিয়েই তো বাতাস। বাতাসের প্রবাহ বলতে এদেরই প্রবাহ বোঝায়। পৃথিবীতেই বাতাসের উৎপত্তি। পৃথিবীর চারপাশেই তার বিচরণ।

সূর্য থেকেও সৃষ্ট হয় এক ধরনের বাতাস। তার প্রচণ্ড প্রবাহকেই বলা হয় সৌর ঝড়। পার্থক্য শুধু এই, পৃথিবীর বাতাস পৃথিবীর চারপাশেই শুধু বিচরণ করে। অবশ্য তার কিছু পরিমাণ যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করে মহাকাশে পাড়ি দেয় না, সে কথা অবশ্য বলবো না। পাড়ি দেয়। তবে পরিমাণে খুবই কম। আর সূর্যের বাতাস, ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ে সৌরমণ্ডলের সর্বত্র। এমন কি সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে সুদূর নক্ষত্র জগতের দিকে পাড়ি দেয়। এই বাতাসের মুখ্য উপাদান হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনও যে শুধু পরমাণু হিসেবে থাকে, তাও নয়। থাকে নিউক্লিয়াস হিসেবে। আর হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস মানেই তো পজিটিভ আধান সমন্বিত প্রোটন কণা। সেই সঙ্গে থাকে কিছুটা ইলেকট্রন, যাদের বলা হয় রিলেটিভিসটিক ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনের গতি প্রায় আলোর গতির সমান। থাকে নানা রকম আয়নিত কণা। সূর্য থেকে সৃষ্ট হয়ে সৌর মণ্ডলের সর্বত্র প্রবাহিত হয় বাতাসের মত। পৃথিবীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এই বাতাসের গতি এসে দাঁড়ায় সেকেণ্ডে 400 কিলোমিটারের মত। সত্যি কথা বলতে কি, জ্যোতিঃ-পদার্থ-বিজ্ঞানীদের এই সৌর ঝড় বিরাট এক বিস্ময়।

সৌর ঝড় সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য করেছিলেন নরওয়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপক ওলাফ কে. বার্কল্যাণ্ড। 1896 খ্রীস্টাব্দে। বলতে পারো, তিনিই প্রথম বলেছিলেন, শুধু আলোই নয়, আলো ছাড়াও সূর্য প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে আরো কিছু কিছু বস্তুকণা। এইসব কণা তড়িৎ আধান বয়ে নিয়ে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে এসে পৌঁছায়। পৌঁছানোর পর তারা প্রতিক্রিয়া করে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে। তার ফলেই সৃষ্ট হয় মেরু প্রভা।

1930 সালে ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামান বৃটিশ ভূপদার্থ-বিজ্ঞানী সিডনি চ্যাপম্যান এবং ভি. সি. এ. ফেররারো। তাঁরাও বলেন, সূর্য থেকে প্রতিমুহূর্তে বেরিয়ে আসছে বিশেষ এক ধরনের মেঘ। এই মেঘের মধ্যে থাকে তড়িৎ আধান। সেই মেঘ সেকেণ্ডে 1000 থেকে 2000 কিলোমিটার বেগে ধাবিত হয়ে সারা সৌরমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে।

1950 সালে নতুন একটি কথা শোনালেন পশ্চিম জার্মানির গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুডভিগ এফ. বায়ারমান। অনেকেই হয়ত তোমরা জান, ধূমকেতু তখন সূর্যের কাছাকাছি হয়, তার লেজটি সূর্যের বিপরীত দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। এরই বা কারণ কী? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, এর কারণ আর কিছু আলোর ধাক্কা। আলোক কণা, যাকে বলা হয় ফোটন। তার ধাক্কাতেই বেঁকে যায় ধূমকেতুর লেজ। সূর্যের কাছাকাছি এলে এই ধাক্কা বাড়ে। ধূমকেতুর লেজ তার ডগার বিপরীত দিকে ঝাঁটার মত ছড়িয়ে যায়। বায়ারমান বললেন, এ ক্ষেত্রে আলোর ধাক্কা নিশ্চয় কাজ করে। তবে লেজটি যেভাবে দীর্ঘতর হয় তাতে মনে হয় ধাক্কার পরিমাণটা খুবই বেশি। একমাত্র ফোটনের পক্ষে অতটা ধাক্কা দেওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র বস্তুকণার পক্ষেই সম্ভব। ওই বস্তুকণা সূর্যের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসে।

একদল বিজ্ঞানী বললেন, বায়ারমান সত্যি কথাই বলেছেন। সূর্যে যখন হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে, তখন সৃষ্ট হয় বিরাট ছটা। সেই ছটা থেকে উত্তাল হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে নানা রকম সৌর কণা। কথাটা যে মিথ্যে তাও নয়। সত্যিই ওই সময় সূর্য থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস বা প্রোটন কণা বেরিয়ে আসে। আবার কেউ কেউ বললেন, সৌর কলঙ্কের মধ্যে ঘটে তড়িৎ চৌম্বক কাণ্ডকারখানা। সেই কাণ্ডকারখানাই ত্বারিত করে ওই সব কণা। কণাগুলি সৌর কলঙ্কের মধ্যেই সৃষ্ট হয়। ত্বারিত হয়ে আলোক রশ্মির মত সরল পথ বরাবর অগ্রসর হয়।

পরে অবশ্য জানা গেছে, সৌরচ্ছটা বা কলংকই শুধু নয়। সূর্যের সমস্ত অঞ্চল থেকে প্রতিমুহূর্তেই ওই সব তেজস্ক্রিয় কণা বিকীর্ণ হচ্ছে।

পরে মহাকাশ যান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে পর্যবেক্ষণ চালান হয়। এর ফলে জানা গেল অনেক চমকপ্রদ ঘটনা। জানা গেল, সূর্যের পরিমণ্ডল ত্যাগ করার সময় ওই সব কণার তাপমাত্রা দাঁড়ায় এক লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের চারপাশে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন কণা। নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে পজিটিভ আধানযুক্ত প্রোটন কণা এবং বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণা নিউট্রন। অনেকেই তোমরা জান, ইলেকট্রনে থাকে নেগেটিভ বিদ্যুৎ আধান। এখন ব্যাপার যে, কি অমন প্রচণ্ড তাপমাত্রায় পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়। ফলে পরমাণু আয়নিত হয়। এমন অবস্থায় সূর্য থেকে নির্গত গ্যাসের (হাইড্রোজেন প্রভৃতি) মধ্যে থাকে ইলেকট্রন কণা এবং আয়নিত গ্যাস। কিছু পরিমাণ অনাহিত গ্যাসও থাকতে পারে। এই অবস্থায় ওই গ্যাসকে বলা হয় 'প্লাজমা'। এই প্লাজমাই সৌর ঝড় হিসেবে সৌরমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, সৌর ঝড় ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় সেখানকার বাতাসের তাপমাত্রা 200000 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত এসে দাঁড়ায়। এই তাপমাত্রাই ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তরকে উষ্ণ অবস্থায় রাখে। পৃথিবীর কাছাকাছি এলে সৌর বাতাসের ঘনত্ব অনেকটা কমে যায়। প্রতি ঘনসেণ্টিমিটারে দাঁড়ায় 100 থেকে 1000টি প্রোটন। বলা হচ্ছে, সৌর ঝড়ের ছটায় 160 জ্যোতিঃ সীমা পর্যন্ত। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে বলা হয় 1 জ্যোতি সীমা।

এই সৌর ঝড়ের দরুনই তৈরি হয়েছে পৃথিবীর আয়ন-মণ্ডল। পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশের ওজন স্তর স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে।

বছর কয়েক আগে একটি ভয়ের কথাও শুনিয়েছেন কেমব্রিজ ইনস্টিটিউট অফ্ অ্যাস্ট্রোনমির দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী —মিচেল বেগেলম্যান এবং মার্টিন রিজ্। সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে পরিক্রমণ করতে করতে এক এক সময় আমাদের ছায়াপথ নক্ষত্রজগৎ বা মিলকিওয়ে গ্যালাকসির এক একটি বাহুর মধ্যে গিয়ে হাজির হয়। যাদের বলা হয় 'স্পাইরাল আর্মস' বা সর্পিল বাহু—মহাজাগতিক গ্যাস এবং ধূলিকণা দিয়ে তৈরি। বাহুগুলির মধ্যে দিয়ে চলার সময় সৌর ঝড়ের অগ্রগতি বাধা পায়। সৌর বাতাসের পরিমাণ কমে। এই সময় পৃথিবীর বুকে নেমে আসে বরফ যুগ। বরফ আর বরফ। সেই বরফে নিরক্ষীয় অঞ্চলও ঢেকে যায়। তবে আসার কথা এই, এ ধরনের বরফ যুগ আসে কুড়ি কোটি বছর অন্তর।

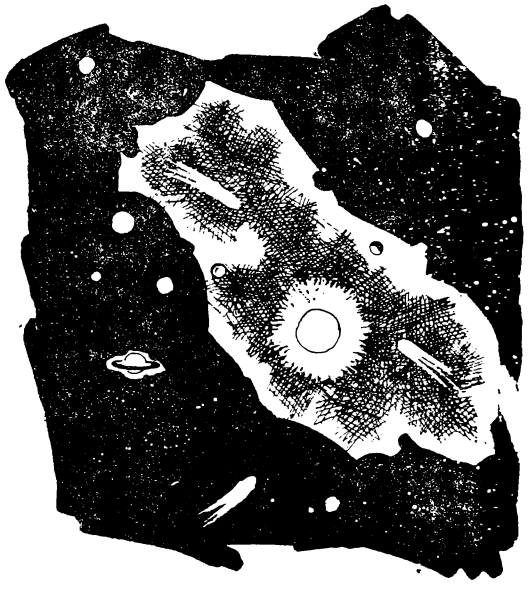

তত দিনে পৃথিবীতে আমরা কেউ বেঁচে থাকব না। পুরো মানব সভ্যতাই বিলীন হয়ে যাবে।

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০·০০ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

রেল গবেষণা ডিজাইন ও স্ট্যাণ্ডার্ডস্ প্রতিষ্ঠান বিমান বসু

ভারতে প্রথম ট্রেন চলেছিল আজ থেকে 135 বছর আগে, 1853 সালের 16 এপ্রিল। সেদিন স্টীম চালিত প্রথম ট্রেনটি যাত্রা করেছিল বম্বে থেকে থানা পর্যন্ত মাত্র 34 কিলোমিটার দূরত্ব। আজ আমাদের দেশে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় 62,000 কিলোমিটার, যা এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম। ভারতীয় রেলপথে আজ প্রতিদিন প্রায় পৌনে বারো হাজারটি ট্রেন চলে। তাদের মধ্যে বেশ ক'টি দ্রুতগামী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসও রয়েছে।

আবার শুধু যে রেলপথের দৈর্ঘ্য ও ট্রেনের সংখ্যাই বেড়েছে তা নয়। ট্রেনের গতিবেগও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ আমাদের রেলপথে প্রতি ঘণ্টায় 140 কিলোমিটার বেগে ট্রেন চলছে। ব্যস্ত রুটগুলিতে বেশির ভাগই স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সিগন্যাল প্রণালী চালু করা হয়েছে। এতে ট্রেন যাত্রা অনেক নিরাপদ হয়েছে। শক্তিশালী ডিজেল ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে ট্রেনের যাত্রীবহন ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। যেখানে আগে দূরপাল্লার ট্রেনের সাধারণত 8-9টি কামরা থাকত। এখন সেখানে 22-23টি কামরার ট্রেন নিয়মিত চলছে।

গত কয়েক দশকে রেলে যাতায়াতের নানা রকম সুবিধেও বেড়েছে। আজ রেলযাত্রা আগের তুলনায় অনেক বেশি আরামদায়ক হয়েছে। কাঠের বেঞ্চের বদলে থ্রীটিয়ার স্লীপার কোচে গদি লাগানো বার্থে আরামে শুয়ে যাওয়া যায়। এসি চেয়ারকারে প্রায় প্লেনের মতই আরাম। খাবার দাবারও আজকাল ট্রেনে অনেক ভাল পাওয়া যায়।

ভারতীয় রেলের এই বহুমুখী অগ্রগতির পেছনে যে গবেষণা সংস্থাটি রয়েছে তার নাম 'রিসার্চ ডিজাইন্স্ অ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডার্ড্স্ অরগানাইজেশন' (Research Designs and Standards Organisation) বা সংক্ষেপে 'আর. ডি. এস. ও'। ভারতে রেল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে গবেষণা চালানো, রেলপথে ব্যবহার যোগ্য বিভিন্ন কলকব্জা, যন্ত্রপাতি নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদির উপযুক্ত মান নির্ধারণ এবং উন্নত ধরনের রেলের কোচ, ইঞ্জিন, সিগন্যালিং প্রণালী ইত্যাদির ডিজাইন তৈরি করাই লক্ষ্ণৌ-এ অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ।

1947 সালে ভারত যখন স্বাধীন হয় সে সময় দেশে কোনও সমন্বিত রেল চলাচল প্রণালী ছিল না। বিভিন্ন রাজ্যের রেল প্রণালীর মধ্যে কোথাও কোথাও অসামঞ্জস্য এত বেশি ছিল যে এক প্রণালীতে ব্যবহৃত কোনও কলকব্জা বা যন্ত্রাংশ অপর কোনও প্রণালীতে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। ফলে প্রতিটি প্রণালীর জন্য এক এক মাপের ফিটিংস ইত্যাদি তৈরি করা হতো। এ সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্য নিয়েই স্বাধীনতার আগে 1930 সালে সিমলায় 'সেণ্ট্রাল স্ট্যাণ্ডার্ড্স্ অফিস' (Central Standards Office) খোলা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় রেলের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর নকশা ইত্যাদি ইংল্যাণ্ডেই তৈরি করা হতো। 1952 সালে দেশেই একাজের জন্য 'রেলওয়ে টেস্টিং অ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার (Railway Testing and Research Centre) স্থাপিত হয়। তারপর 1957 সালে এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে মিলিয়েই আর. ডি. এস ও গঠিত হয়।

যে কোনও রেল প্রণালীর এক প্রধান অঙ্গ হলো রেল লাইন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত লাইন পাতা হতো কাঠের স্লীপারের ওপর লোহার খোঁটা দিয়ে। দু'টি রেলের মধ্যে কয়েক মিটার অন্তর ফিসপ্লেট লাগিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা হতো। তাছাড়া গরমে লাইনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় বলে ফিসপ্লেটের মাঝে দু'টি রেলের মধ্যে ফাঁক রাখার প্রথা ছিল। এভাবে পাতা লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন চললে শুধু যে খুব বেশি শব্দ হতো তা নয়, ট্রেনের চাকা এবং রেল দুইয়েরই দ্রুত ক্ষয় হতো।

আর. ডি. এস. ও-তে গবেষণা চালিয়ে জানতে পারা গেছে যে কাঠের বদলে কংক্রীটের স্লীপারের ওপর কোনও ফাঁক ছাড়া কয়েক কিলোমিটার লম্বা অবিচ্ছিন্ন রেল (long welded rail) মজবুত করে বসালে দ্রুতগামী ট্রেন চলাচলের জন্য লাইন আরও নিরাপদ হয় এবং তাতে ঝাঁকুনিও লাগে অনেক কম। তাছাড়া এতে চাকা ও রেলের ক্ষয়ও অনেক কমে যায়। এখন দেশের প্রধান রেলপথগুলিতে আর. ডি. এস. ও'র তৈরি নির্দেশক অনুসারে কংক্রীটের স্লীপারের ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে এবং তার ফলে ট্রেনের গতিবেগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

লম্বা অবিচ্ছিন্ন রেল তৈরির জন্য লাইন পাতার সময়েই ঝালাই করার উন্নত পদ্ধতিও আর. ডি. এস. ও'র বিজ্ঞানীরা বের করেছেন।

রেল প্রণালীর দ্বিতীয় প্রধান অঙ্গ হলো তার 'রোলিং স্টক' (rolling stock), যেমন যাত্রীবাহী কোচ, মালবাহী ওয়াগন ইত্যাদি। যাত্রীবাহী কোচ ডিজাইনে যেমন যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, মালগাড়ির ওয়াগন ডিজাইনারদেরও তেমনি কি ধরনের মাল বইতে হবে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। কারণ, কয়লা বা লোহার খনিজ নিয়ে যাওয়ার জন্য যে খোলা ওয়াগন ব্যবহার করা হয় তা কখনোই পেট্রল বা রান্নার তরল গ্যাস বহনের কাজে আসতে পারে না। কখনো আবার বিশাল আকারের কিংবা প্রচণ্ড ভারি যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ ধরনের ওয়াগনের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সম্প্রতি রেল বিভাগ মাল বহন করার জন্য 'কণ্টেনার' সেবা (container service) শুরু করেছেন যার ফলে কারখানা বা বাড়ির দোরগোড়া থেকে মাল তুলে নিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবার সুবিধে হয়েছে। এ সব বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য চাই আলাদা আলাদা ওয়াগন।

যাত্রী-কোচের বেলায় আর. ডি. এস. ও'র এক প্রধান লক্ষ্য হলো কোচের ওজন যথাসম্ভব কমানো, কারণ হাল্কা কোচ হলে ইঞ্জিনের শক্তি না বাড়িয়েও ট্রেনের গতিবেগ বাড়ানো সম্ভব। ধাতুর বদলে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক এবং স্টীলের বদলে অ্যালুমিনিয়াম মিশ্র ধাতুর পাত ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই হাল্কা যাত্রী কোচ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

আর. ডি. এস. ও'তে উদ্ভাবিত যে সব নতুন ডিজাইন ইতিমধ্যে কাজে লাগানো হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে যাত্রীবাহী দ্বিতল বিশিষ্ট (double-decker) কোচ, 150 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে চলার উপযুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেয়ার কার এবং স্লীপার কোচ, পাঁচ টন মাল বহনের জন্য উপযুক্ত কণ্টেনার বাক্স এবং ওয়াগন এবং 100 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে চলার উপযুক্ত দুধ বহনকারী রেফ্রিজারেটেড্ ট্যাঙ্কার ওয়াগন। এছাড়া 160 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে চলার উপযুক্ত যাত্রীবাহী কোচের ডিজাইনও আর. ডি. এস. ও'র ইঞ্জিনিয়ারেরা তৈরি করেছেন। কলকাতার মেট্রো রেলের জন্য কোচের ডিজাইনও এখানে তৈরি হয়েছিল।

ট্রেনের গতিবেগ বাড়ানোর একমাত্র উপায় হলো আরও শক্তিশালী ইঞ্জিনের ব্যবহার করা। স্টীম ইঞ্জিনের চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার ভারতীয় রেলপথে শুরু হয় প্রায় পঁচিশ বছর আগে। তারপর দেশেই ডিজেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানাও খোলা হয়েছে। কিন্তু আজও সে সব কারখানায় যে ডিজেল লোকোমোটিভ তৈরি হয় তাদের ডিজাইন কুড়ি বছরেরও বেশি পুরানো, কারণ দেশে এ ধরনের ইঞ্জিন নিয়ে গবেষণা একেবারে হয়নি বললেও চলে। সম্প্রতি আর. ডি. এস. ও'তে এ বিষয় নিয়ে গবেষণা চালানোর জন্য একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে এবং একটি বিশেষ গবেষণাগারে আধুনিকতম মাইক্রোপ্রসেসর (microprocessor) ভিত্তিক ইঞ্জিন পরীক্ষণ যন্ত্র লাগানো হয়েছে।

ভারতীয় রেলপথে আজ বৈদ্যুতিকৃত লাইনের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় 6500 কিলোমিটার। বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিনের সংখ্যা প্রায় 1200। এদের বেশির ভাগই আর. ডি. এস. ও'তে উদ্ভূত ডিজাইন অনুসারে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্ এ তৈরি। এখানেই তৈরি 4000 অশ্বশক্তির শক্তিশালী WAP-1 শ্রেণীর বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন বর্তমানে নতুন দিল্লী ও হাওড়ার মধ্যে 18-কোচ বিশিষ্ট রাজধানী এক্সপ্রেসে ব্যবহার করা হচ্ছে। WAP-1 ইঞ্জিনের বৈশিষ্ট্য এই যে এতে দ্বৈত ব্রেক প্রণালী থাকার দরুন দ্রুতগামী হওয়া সত্ত্বেও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুব কম।

রেলপথে নিরাপত্তার জন্য আর. ডি. এস. ও'র বিজ্ঞানীরা এমন বহু যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন যা আগে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। ঐ সব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ট্রেনের চাকার অক্ষদণ্ড গণক (axle counter), স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল প্রণালী, ট্রেনের চালক ও গার্ডের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের ভি এইচ এফ (VHF) বেতার সঞ্চার প্রণালী ইত্যাদি। রেল লাইনের ত্রুটি পরীক্ষার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি লাগানো রেল কোচও আর. ডি. এস. ও'র কাছে আছে। বর্তমানে রেলের জন্য সৌরশক্তি চালিত সিগন্যাল ও দূরসঞ্চার প্রণালী, মাইক্রোপ্রসেসর চালিত রুট কনট্রোল প্রণালী ইত্যাদি নিয়ে এখানে গবেষণা চালানো হচ্ছে।

আর. ডি. এস. ও'তে গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেতু নির্মাণ পদ্ধতি। রেলপথ নির্মাণের সময় বিভিন্ন ধরনের সেতু নির্মাণের প্রয়োজন হয়। যেমন খরস্রোতা নদীর ওপর অথবা পাহাড়ী অঞ্চলে গভীর গিরিখাদের ওপর কিংবা শহরাঞ্চলে রেলপথের ওপর সড়ক সেতু ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই চাহিদা আলাদা আলাদা। আর. ডি. এস. ও'র ইঞ্জিনিয়ারেরা বিভিন্ন ধরনের সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় স্টীল ও কংক্রীটের গার্ডার ইত্যাদির এমন ডিজাইন তৈরি করেছেন যাতে করে শুধু নতুন সেতু নির্মাণেই নয় কোনও দুর্ঘটনার পর ভেঙে যাওয়া সেতু মেরামতের কাজেও যথেষ্ট সুবিধে হয়েছে।

আমরা যখন ট্রেনে চড়ি, তখন হয়ত আমরা বুঝতেও পারি না আমাদের যাত্রা নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য একদল বিজ্ঞানী অক্লান্ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু জনসাধারণের অলক্ষ্যে থেকেও আর. ডি. এস. ও'র বিজ্ঞানীরা যে কাজ করে যাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয়।

7 ইউ. এফ. কলেজ রোড, নতুন দিল্লী 1

প্রাণীবিচিত্রা — কমল চক্রবর্তী

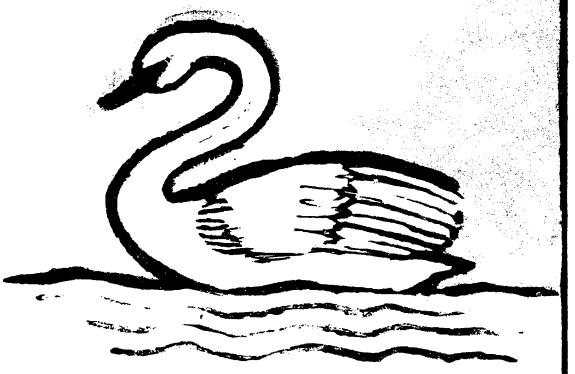

একটি দুধের মত সাদা রাজহাঁস জলের উপর দিয়ে যখন ভেসে ভেসে যায়—সে দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয় না এমন লোক কমই আছে। তার গ্রীবা ঘোরানো ফেরানো, নানা দিকে সঞ্চালিত করার মত রমনীয় সৌন্দর্য বোধ হয় আর নেই।

কিন্তু রাজহংসের মেজাজ মোটেই ভাল নয়। সে যখন অপর একজনের সঙ্গে ঝগড়ায় মত্ত তখন মনে হয় তার স্বভাব অতি হিংস্র, চেহারার সঙ্গে তার মিল নেই।

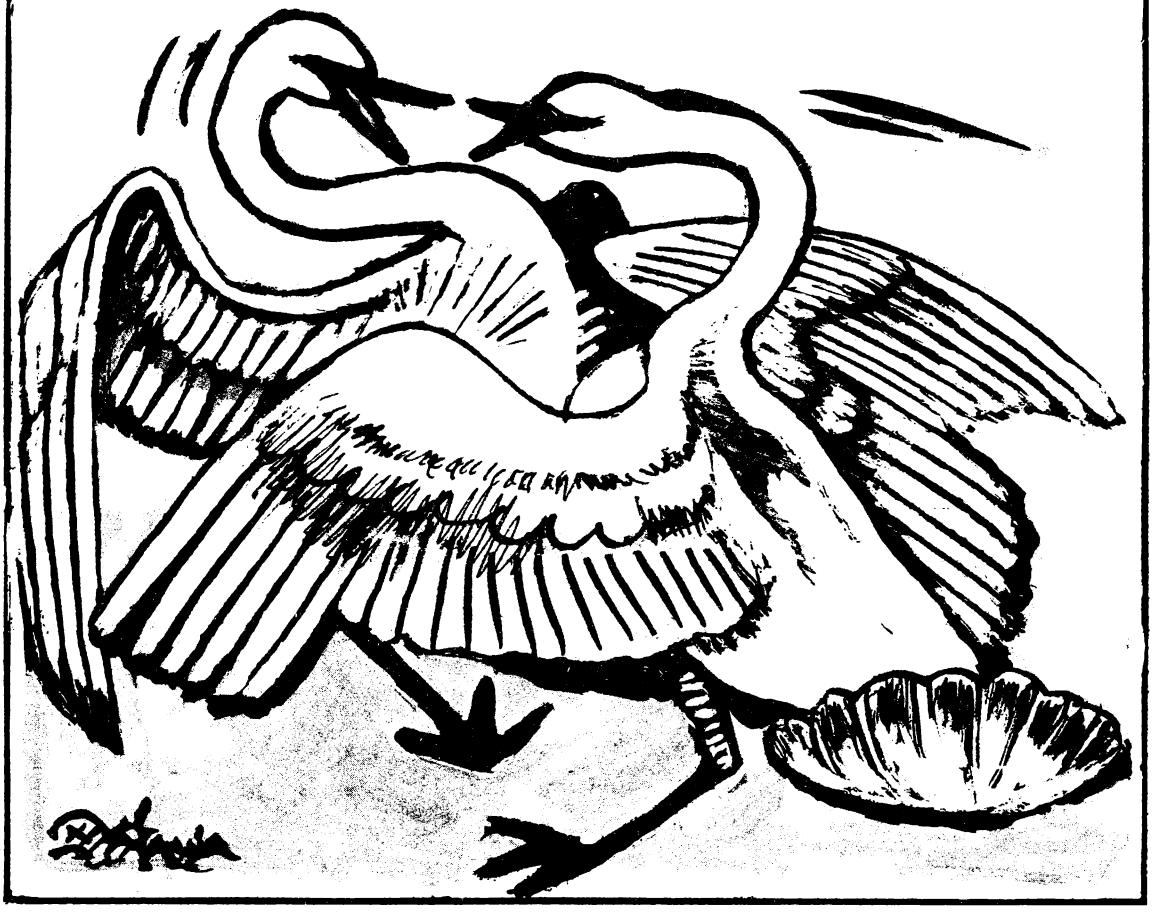

রাজা জনের আমন্ত্রণ তাঁকে দিল এক নতুনতর উন্মাদনা। তিনি উপহাসের পাত্র নন। রাজা জনের বিশ্বতত্ত্ববিদ পন্ডিতের দল তাঁর ধারণাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করেছেন। এই চিঠি নাহলে আসতো না।

কাছেই রয়েছেন মেদিনা-সিদোনিয়ার ডিউক। অগাধ তাঁর ঐশ্বর্য। কলম্বাসের অভিযান বাস্তবায়িত করবার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল, তবু ডিউক রাজী হলেন না। ভোগসুখের ফেনায়িত জীবনের বাইরে পৃথিবীর আর কোন উদ্দেশ্যের পিছনে আপন সম্পদ তিনি বিনিয়োগ করতে চাইলেন না। অদম্য কলম্বাস এবার শরণাপন্ন হলেন মেদিনা-সেলীর কাউন্টের। তিনিও তখন অফুরন্ত সম্পদের অধীশ্বর। সাগরে সাগরে ভ্রাম্যমান তাঁর জলযানগুলি ঐশ্বর্যের পাহাড় দিনে দিনে রচনা করে চলেছে। কলম্বাসের অসম-সাহসিক পরিকল্পনা তাঁকে বিচলিত করলো। আপন প্রাসাদের একপাশে তিনি অতিথি করে নিয়ে এলেন নবাগত তরুণকে। দিনের পর দিন তাঁর পরিকল্পনা, তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে সব জানলেন। উৎসাহ যোগালেন নব নব উদ্দীপনায়। আর্য সভ্যতার লীলাভূমি স্বর্ণ-ময় মণিমাণিক্যভূষিত ভারতবর্ষ। আজ সেখানে যাবার পথ বন্ধ। তাই নতুন এক জলপথ যেদিন আপনি আবিষ্কার করবেন, সেদিন ইউরোপের সুদূর-তর সব প্রান্ত থেকেও বহু মানুষ ছুটে আসবে ভারত-বর্ষের প্রত্যাশায়। সেই অসম্ভবকে আপনি সম্ভব করুন ক্রিস্টোফার। আমার জাহাজের দু-চারটি আপনার অভিযানের জন্যে স্বচ্ছন্দে আপনি নিতে পারেন। আমি দেবো। যাবে আমার বিশ্বস্ত নাবিকের দল। আপনিই হবেন তাদের কর্ণধার। অন্যান্য সব প্রস্তুতি আপনি মনের মতো করে গড়ে নিন ক্রিস্টোকার। ইতিহাসের চাকা আপনার নিপুণ হাত দিয়ে চালিত করুন।

আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন কলম্বাস। কতো দীর্ঘ সুদীর্ঘ নিরাশাকঠিন রাত্রির পরপারে আজ উজ্জ্বল ভোরের আশীর্বাদ তিনি পেয়েছেন তাঁর স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে। কতো সুখ

আজ ফেলিপা যদি কাছে থাকতো। বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস কাউন্টকে গোপন করে নিঃশব্দে ঝরে যায়।

দু-দুটো বছর কখন শেষ হয়ে গেল প্রস্তুতির উন্মাদনায়। নাবিকদের মাঝ থেকে নিজের মনের মতো এক একজনকে বেছে নিয়ে তিনি রচনা করলেন সুদীর্ঘ তালিকা। মাটির পৃথিবীতে পায়ে পায়ে কলম্বাস হেঁটে যান, কিন্তু মন ভেসে চলে সমুদ্রে। সেখানে একটার পর একটা নতুন সমস্যা দিনে দিনে জেগে ওঠে। বিচক্ষণ নাবিক তার সমাধান করে চলেন অসীম দক্ষতায়। তিনি লড়াই করে চলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে। নাবিকদের বিদ্রোহেও তিনি অকুতোভয়। সব বাধা, সব বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলে তাঁর জলযানের বহর। এক অনাবিষ্কৃত দিগন্তের অভিযানে—সার্থকতার লক্ষ্যে।

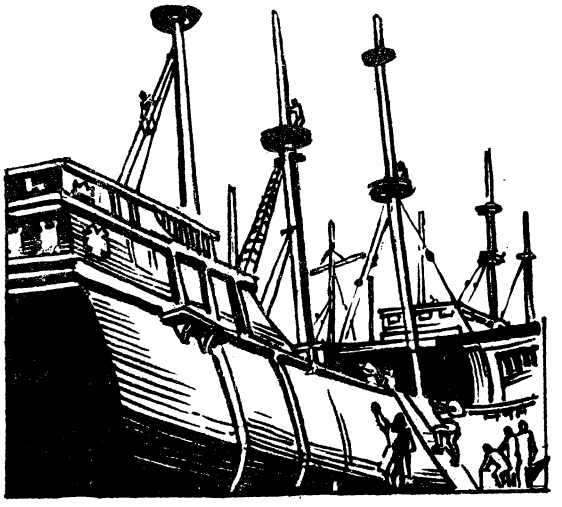

সুদীর্ঘ প্রস্তুতির শেষভাগে এসে গেল পরিপূর্ণতার সম্ভাবনা। কলম্বাস তন্ময়—তাঁর দুচোখে স্বপ্নের আলপনা। নতুন পৃথিবীর মাটিতে নেমে যে পতাকা তিনি প্রোথিত করবেন, তার রূপ কি তিনি নিজের মতো করেই দেবেন? এল মিনা-র সেণ্ট জর্জ দুর্গের মতো সেই নতুন দিগন্তে কি তিনি গড়ে তুলবেন নতুন দুর্গ, নাকি সহজ সরল মানুষের মাঝখানে শান্ত নিবিড় আশ্রমের মতো একদিন রচিত হবে তাঁদের উপনিবেশ?

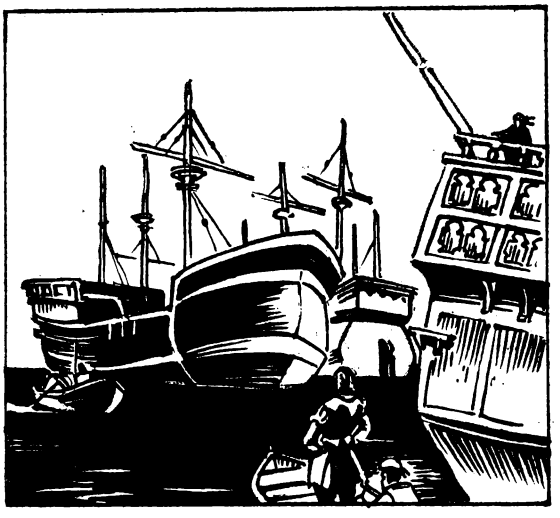

মেদিনা সেলির স্বপ্ননীড় কিন্তু হঠাৎই একদিন ভেঙ্গে গেল। আয়োজনের খুঁটিনাটির দিকে দেখতে দেখতে কেমন বিভ্রান্ত বোধ করলেন সহমর্মী কাউন্ট। যে অভিযানের উদ্যোগে কলম্বাস নেমেছেন, তার আয়োজন কি একজন প্রজার পক্ষে করা সম্ভব? যদি ত্রুটি কোথাও থেকে যায়? যদি তারই জন্যে কলম্বাসের অভিযান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়? ঈশ্বর প্রেরিত এমন অসাধারণ মানুষের জীবন যে তবে শেষ হয়ে যাবে আটলান্টিকের অতলে। কোন খবরই পৃথিবী পাবে না।

(ক্রমশ)

কেশ পরিচর্যার নব দিগন্ত

নতুন দিনের নতুন তেল

হাসিনা

হেয়ার অয়েল

হাসিনা হেয়ার অয়েল নিয়মিত ব্যবহারে চুল হয়ে উঠবে সজীব, ঘন কালো, রেশম কোমল। উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে প্রতিদিন। চুলের স্বাস্থ্য ও শোভায় আপনার জীবন আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠবে।

এটি কোন প্রসাধনী সামগ্রী নয়

বিপণন ব্যবস্থায় : দয়া ট্রেডিং কর্পোরেশন

রেজিঃ অফিস
দিল্লী রোড, ডানকুনি, হুগলী
ফোন—৬৪-৩১৯৪

সিটি অফিস
৬/এ, সাকলেত প্লেস, কলি-৭০০ ০৭২
ফোন—২৭-৮৬১৯

জেলাভিত্তিক/এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটর চাই

প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের জীবন ও কাজ ঃ একটি তথ্যচিত্র

ধ্রুবজ্যোতি দে

আমাদের চারপাশ ঘিরে রয়েছে গাছপালা, পশুপাখি, পোকামাকড়, মাটি-জল-বাতাস। এরা সবাই মিলে গড়ে তুলেছে আমাদের বিশ্বপ্রকৃতি। এই প্রকৃতির সাহচর্যে, এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। অথচ এই প্রকৃতির কতটুকু আমরা জানি? কতটুকু জানি আমাদের বাংলার প্রকৃতিকে? গোপালচন্দ্র ছিলেন এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি তাঁর সারা জীবন দিয়ে বাংলার প্রকৃতিকে গভীরভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত পথে জানার এবং জানানোর চেষ্টা করে গেছেন। একাজে এখনও তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরেও তিনি অদ্বিতীয়। এত বড় মাপের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, অথচ তাঁর নামটির মতই তিনি ছিলেন সরল, সাদাসিধে, মিশুকে, নিরহঙ্কারী এক অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী। গোপালচন্দ্রের কাজই ছিল তাঁর জীবন। তাঁর সারা জীবনই ছিল বিজ্ঞানের প্রতি উৎসর্গীকৃত, অন্য আর সব কিছুর প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন।

ভাস্কর রায়ের 'গোপালচন্দ্র' ছবিটি প্রথম থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সনিষ্ঠ। ছবিটি শুরু হতেই আমরা দেখতে পাই 1974-এ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী গোপাল-চন্দ্র ভট্টাচার্যের নাগরিক সংবর্ধনা। গোপালচন্দ্র তখন 79 বছরের বৃদ্ধ। তাঁর কর্মক্ষমতা প্রায় রুদ্ধ, যদিও মস্তিষ্ক ছিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সচল ও সক্রিয়। উল্টোডাঙার হরিশ নিয়োগী রোডের একতলার সেই ঘর। সেই পরিত্যক্ত চৌকি। যেখানে শেষ দিন পর্যন্ত ভেবে গেছেন তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলির কথা, বিভোর থেকেছেন প্রকৃতিবিজ্ঞানের কথা ভেবে, সে সময়ে যেই গেছেন তাঁকেই ছোঁয়া দিয়েছে সেই তন্ময়তা। ভাস্কর রায়ের ক্যামেরাও নেমে এসেছে সেই ঘরে। যখন এসেছে তখন আর তিনি সেখানে নেই। কিন্তু আমরা অনুভব করি তাঁর সত্তার উপস্থিতি। আমরা খুঁজতে শুরু করি সেই সত্তার জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি।

ক্যামেরা তখন আমাদের নিয়ে গেছে আদি, অকৃত্রিম, বাঙলার গ্রামে। গোপালচন্দ্র জন্মেছিলেন এমনই এক গ্রামে। 1895 সালে 1লা আগস্ট ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রাম। বাঙলার প্রকৃতি তার সমবেত প্রাণসত্তা নিয়ে উন্মুক্ত ছিল গোপালচন্দ্রের কাছে। শৈশব কৈশোরের গোপাল আর পাঁচটা শিশু কিশোরের মত এই প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে আনন্দ পেয়েছেন, প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছেন। গোপাল চন্দ্র তথ্যচিত্রটিও একই ভাবে আমাদের গ্রাম বাঙলার প্রকৃতির সাথে একাত্ম করে ভালবাসায় আপ্লুত করে।

গোপালচন্দ্র পড়াশোনা করেছেন লোনসিং গ্রামের হাইস্কুলে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি কৌতূহল ও ভালবাসার গোপালচন্দ্র স্কুলের প্রথাগত পড়াশোনার থেকেও প্রকৃতি থেকে পাঠ নিতে বেশি আনন্দ পেতেন। স্কুলের পড়াশোনা ছাড়াও তাই তাকে আমরা দেখি প্রকৃতির মধ্যে, গাছপালা পোকামাকড়, পশু-পাখির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দেখছেন, নিজের মত পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এরই মধ্যে স্কুলের মাস্টারমশাই যোগেন বাবুর কাছে গোপালচন্দ্র প্রকৃতিবিজ্ঞানের ধারণাগুলি পাচ্ছেন। কার্য-কারণ সম্পর্ক-গুলি খুঁজতে শিখছেন। জানতে পারছেন, আজকে যেটা ছিল শুঁয়োপোকা কাল সে কেমন করে প্রজাপতি হয়ে গেল। যোগেনবাবু ক্লাসের টেবিলে কতকগুলো লাফানো বীন-জাতীয় বীজ কেটে দেখাচ্ছেন তার মধ্যে পোকার শুকগুলিই সেগুলোর লাফানোর কারণ। কারণ আবিষ্কারের আনন্দে গোপালচন্দ্র আরও নিবিড়ভাবে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করছেন, নিরীক্ষা পরীক্ষা করছেন।

তথ্যচিত্রটিতে এরপর আমরা দেখছি গোপালচন্দ্রের মধ্যে কেমনভাবে গড়ে উঠছে সাহিত্যবোধ। মায়ের কাছে রামায়ণ মহাভারত-এর গল্প শুনে তার প্রথম সাহিত্য বোধ গড়ে ওঠে। পরে গোপালচন্দ্র হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে-ছেন, সমাজ-সেবামূলক ও কুসংস্কার বিরোধী কাজের সঙ্গে জারি গান, পালা গানের দল বেঁধেছেন, ছড়া-কবিতা লিখেছেন এবং রচনা করেছেন বাঙলার বিজ্ঞান সাহিত্য জগতের অসংখ্য মণিমুক্তো। পারিবারিক অর্থনৈতিক কারণে ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়ে গোপালচন্দ্র এলেন গ্রামে শিক্ষকতা করতে। ছাত্রদের নিয়ে তিনি আবার মেতে উঠলেন প্রকৃতি-চর্চায়। এই সঙ্গে চলল তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধান আর তাই নিয়ে লেখালেখি। পচাগাছের আলো দেখে জৈবদ্যুতি নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন প্রবাসীতে। এই প্রবন্ধটি চোখে পড়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু-র। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তিনি গোপালচন্দ্রকে ডেকে নিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে।

গোপালচন্দ্র তখন কলকাতায় টেলিফোন অপারেটর-এর চাকরী করেন।

1921-এ গোপালচন্দ্র রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পদে যোগ দেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সেখানে গোপালচন্দ্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কাজকর্ম শিখতে থাকেন। নিজেকে গড়ে তুলতে থাকেন দক্ষ বিজ্ঞানীরূপে। নিজস্ব গবেষণার কাজ শুরু করতে গিয়ে গোপালচন্দ্র আবার প্রকৃতি নিরীক্ষার কাজ শুরু করলেন। ভালবাসা, কৌতূহল, বিস্ময় ও আনন্দ ছাড়াও তখন তাঁর পাথেয় ছিল দক্ষ বিজ্ঞানীর চোখ। তাঁর প্রথম কাজ মেছো মাকড়সার আচরণ নিয়ে গবেষণা। তুললেন অনেক ছবি। মেছো মাকড়সার ওপর রচিত তাঁর প্রথম গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয় বোস ইন্সটিটিউটের 'ট্রানজাকশনে'। গোপালচন্দ্র তথ্যচিত্রটিতেও আমরা মেছো মাকড়সাকে দেখছি মাছের জন্য কেমন ওত পেতে আছে। গোপালবাবুর তোলা সেই ফটোগুলোও দেখছি, দেখতে পাচ্ছি তাঁর জীবনের সেই প্রথম গবেষণা পত্রের ছবি।

গোপালচন্দ্র সেই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাথে যুক্ত হন। আর বাঙলায় সেই অমূল্য বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলি লিখতে থাকেন। এইসঙ্গে গোপালচন্দ্র আরও গভীরভাবে গবেষণার কাজে যুক্ত হন। তার কাজগুলি বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে সাড়া তুলেছিল। 1936-এ নিউইয়র্কে ন্যাচারাল হিস্ট্রী ম্যাগাজিনে তার 'ডাইভিং স্পাইডার' গবেষণাপত্রটি নিউইয়র্ক টাইমস কর্তৃক প্রশংসিত হয়। 1951-তে প্যারিসের 'ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি স্টাডি অফ সোসাল ইনসেক্টস'-এর আলোচনাচক্রে ভারতীয় অধ্যায়টি সংগঠিত করার জন্য গোপালচন্দ্র আমন্ত্রিত হন কিন্তু তাঁর সেই আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি। 30-এর দশকের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রাণী-আচরণবিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ছিল না, কিন্তু তিনি একাই তাঁদের সমতুল কাজ করেছিলেন। গোপালচন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ব্যাঙাচির রূপান্তরের ওপর পেনিসিলিন ও ভিটামিন B_{12}-এর প্রভাব পরীক্ষা। পেনিসিলিনের প্রভাবে ব্যাঙাচির রূপান্তর বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ভিটামিন B_{12}-র প্রভাবে তা আবার শুরু হতে পারে তা গোপালচন্দ্রই প্রথম দেখান। নালসো পিঁপড়ের কৃত্রিম বাসা তৈরি করে এবং খাদ্যে হেরফের ঘটিয়ে শ্রমিক-পিঁপড়ের জন্মরহস্য ব্যাখ্যা গোপালচন্দ্রই প্রথম করেছেন। তার এ সমস্ত কাজের যথাযথ তথ্যসমাবেশ এবং প্রকৃতি থেকে বাস্তব চিত্রায়ণ এই তথ্যচিত্রটিতে নিখুঁতভাবে করা হয়েছে।

গোপালচন্দ্রের জীবনের আরও অনেকগুলি দিক ছিল। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কাজ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদনা, ছোটদের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিজ্ঞান শেখানোর জন্য সহজ পদ্ধতিতে মডেল তৈরির শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি নানা দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন অন্তর দিয়ে। এ সব তথ্যও এসেছে ছবিটির মধ্যে। এই প্রকৃতিনিষ্ঠ বিজ্ঞানীটি দেশে স্বকৃতি পান জীবনের সায়াহ্ন বেলায়। 1968-তে 73 বছর বয়সে আনন্দ পুরস্কার পেয়ে প্রথম স্বীকৃতি পান। 1974-এ বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে নাগরিক সংবর্ধনা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে সত্যেন বসু ফলক লাভ করেন। 1975-এ 'বাঙলার কীটপতঙ্গ' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার, 1979-তে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জুবিলি মেডেল পান। 1980-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. এস-সি দেন।

'গোপালচন্দ্র' তথ্যচিত্রটিতে গোপালচন্দ্রের এই বিশাল কর্মময় জীবনের এই ধারাবাহিকতা ফুটে উঠেছে যথাযথ ভাবে। গোপালচন্দ্রের জীবন মানেই তাঁর কাজ। তাঁর কাজ মানেই প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ। স্বভাবতই তথ্যচিত্রটিতে প্রকৃতি তার সমস্ত রহস্য আর আনন্দ নিয়ে পর্দায় আমাদের সামনে উপস্থিত। আমরা অপার বিস্ময়ে দেখি শুঁয়াপোকা থেকে প্রজাপতি হওয়া, নালসো পিঁপড়ের বাসা আর রানী-পুরুষ শ্রমিক পিঁপড়ের পার্থক্য, মেছো মাকড়সার মাছ ধরা, ব্যাঙাচির রূপান্তর। কিন্তু এই সবকিছু নিয়ে গোটা ছবিটি গোপালচন্দ্রের জীবন-ই অথবা বলা ভাল, তাঁর জীবন দর্শন। ছবির সঙ্গে চলেছে ধারাভাষ্য। যদিও ইংরাজী তবু অতি সরল ও আকর্ষণীয়। আর আছে সঙ্গীত। প্রকৃতির সামগ্রিক প্রাণ প্রবাহের যথার্থ সঙ্গীত রূপায়ণ। এই সবকিছুই করেছেন পরিচালক ভাস্কর রায়। তাঁকে কাজ করতে হয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে। গোপালচন্দ্রের কাজ ও জীবন সম্পর্কে তথ্য এত অপ্রতুল ও অগোছালো, যে তা 'নেই' বলা যায়। দেশী সিনেমা প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা তো আছেই। তবু মনে হয়, 'গোপালচন্দ্র' ছবিটি এই বিষয়ে সর্বৈভাবে যে কোন বিদেশী তথ্যচিত্রের সাথে সমান তালে পাল্লা দিতে পারে। আশা করি ছবিটির বাঙলা ধারাভাষ্য করা হবে এবং গ্রামে-গঞ্জে মফস্বলে দেখানোর ব্যবস্থা করা যাবে। আমি স্থির নিশ্চিত এই তথ্যচিত্র থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আর সারা বাঙলায় ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞানক্লাব কর্মীরা তাঁদের কাজে অনুপ্রেরণা পাবে এবং গোপালচন্দ্রের জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

ষণ্ডেশ্বরতলা চুঁচুড়া, হুগলি

টাকার দাম উশুল করুন

সঠিক ওজন ও মাপ বুঝে নিন

- জিনিসপত্র কেনবার সময় সতর্ক থাকুন। কষ্টার্জিত টাকার ষোলআনা দাম বুঝে নেবার অধিকার আপনার আছে।
- ওজন ও পরিমাপের যন্ত্রাদি পরিদর্শক দ্বারা পরীক্ষিত ও সীল-মোহরাঙ্কিত কিনা দেখে নিন।
- মেট্রিক ওজনে বা মাপে জিনিসপত্র কিনুন—অন্য মাপ বা ওজন ব্যবহার করা বেআইনি।
- বাজার দরের সঙ্গে যাচাই করে নেবার জন্য সোনার গয়না বা স্বর্ণনির্মিত সামগ্রী ১০ গ্রামের হিসেবে কিনুন।
- বিক্রেতাগণ ওজন ও মাপের যন্ত্রাদি বছরে একবার ওজন ও মাপ পরিদর্শক দ্বারা পরীক্ষা ও সীলমোহর করিয়ে নেবেন। সহজে দেখা যায় এমন জায়গায় দাঁড়িপাল্লা রাখুন-এতে ক্রেতাদের আস্থা বাড়বে।
- কাঠের দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ওজন ও পরিমাপের দ্রব্যাদি অনুমোদিত বিক্রেতার কাছ থেকে ক্যাশ মেমোর বিনিময়ে কিনবেন।
- ওজন ও পরিমাপ সম্বন্ধে যে কোনো অভিযোগ স্থানীয় ইন্সপেকটর, কণ্ট্রোলার অফ ওয়েট্স্ অ্যাণ্ড মেজারস্ ৪৫, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা-১৩ এই ঠিকানায় জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ১৭৯২/৮৮

ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ Part IV

বিপ্লব ব্যানার্জী

প্রশ্নসংখ্যা = 12 সময় = 10 মিনিট।

1. 27°c তাপমাত্রায় তামা ও কাঁচের আনুমানিক রোধাঙ্ক নিচেরগুলি হইতে বাহির কর ঃ—a) $1{\cdot}57\times10^{-6}$ Ohm-cm, b) $3{\cdot}7\times10^{10}$ Ohm-cm, c) 19 Ohm-cm, d) 10^{9} Ohm-cm, e) $4{\cdot}7\times10^{6}$ Ohm-cm, f) 10^{12} Ohm-cm, g) $1{\cdot}1\times10^{-5}$ Ohm-cm, h) $1{\cdot}1\times10^{5}$ Ohm-cm, i) 33×10^{-9}Ohm-cm, j) 2.34×10^{-5}Ohm-cm.

2. নিচের কোনটি গ্রহণযোগ্য ?

a) মিনিটে যতগুলি পূর্ণতরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় এক হার্জ

b) এক সেকেণ্ডে একটি পূর্ণতরঙ্গ উৎপন্ন হলে তাকে বলা হয় এক হার্জ

c) এক ঘণ্টায় যতগুলি পূর্ণতরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় এক হার্জ

3. শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

a) এক হার্জ থেকে 20 হার্জ পর্যন্ত কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বলা হয়——

b) 21 হার্জ থেকে 20 কিলো হার্জ পর্যন্ত কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বলা হয়——

d) 20 কিলো হার্জের উপরে যে কোন তরঙ্গকে এক ক যায়——বলা খুবই যুক্তযুক্ত

4. Voltage, Current এবং Resistance এর মধ্যে যে সম্পর্ক সূত্র তাকে বলা হয়,—a) Charles Law, b) Faraday's Law, c) Fick's Law, d) Ohm's Law, e) Child's Law, f) Richardson's Law, g) আদৌ কোন সম্পর্ক সূত্র নাই।

5, কোন পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের বিরুদ্ধে যে বাধা তাকে বলা হয়—a) Conductance, b) Resistance, c) Capacitance

6. নিচের A-Set এবং B-Set এর কোনটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—

A-Set ঃ → a) R, b) V, c) G, d) C, e) I

B-Set ঃ → f) Conductance, g) Current, h) Capacitance i) Resistance, j) Voltage.

7. পরিবাহিতার একক,– a) Vol+, b) mho, c) Farad d) Henry, e) Ohm.

8. নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহীর মত কাজ করিতে সক্ষম—a) Silicon, b) Gold, c) Silver, d) Copper, e) Platinum, f) Carbon, g) Wood h) Rubber, i) Sulpher.

9. একটি তামার তারের দৈর্ঘ্য = 10.0 মিটার, ব্যাসার্ধ = 0·5 মিলিমিটার এবং রোধাঙ্ক = $1{\cdot}6\times10^{-6}$ Ohm-cm হইলে ঐ তারের পরিবাহিতা হইবে,—a 0·05 mho, b) 5 Ohm-cm, c) 22 Ohm, d) 0·1 mho, e) 0·5 Ohm-cm, f) 0·5 mho-cm, g) 0 005 Ohm.

10. একটি ইলেকট্রন কণিকার আনুমানিক ঘনত্ব কত ?

11. একটি বৈদ্যুতিক বর্তনীর দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুর বিভব-প্রভেদ 120 Volts এবং উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত বৈদ্যুতিক আধান 5 কুলম্ব হইলে, সম্পাদিত কার্যের পরিমাণ হইবে,—

a) 24 dynes, b) 24 Joules, c) 3000 Farad d) 300 Joules, e) 24 Farad, f) 600 Joules.

12. একটি বিদ্যুৎ পরিবাহীর একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়া 100 মিলিসেকেণ্ডে $6{\cdot}28\times10^{17}$ টি ইলেকট্রন কণিকা অতিক্রম করিলে ঐ পরিবাহীর মধ্য দিয়া যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটিবে তাহা হইল,—

a) 100 mili Ampere, b) 1 Ampere, c) 10 Ampere, d) 100 Ampere, e) 628 Ampere.

ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ—Part IV-এরউত্তর

1. তামার রোধাঙ্ক, (a), কাঁচের রোধাঙ্ক, (f), 2, (b) 3. [a)-শব্দোত্তর তরঙ্গ বা Subsonic wave, b)-শ্রুতিতরঙ্গ বা Audio wave, c) শব্দোত্তর তরঙ্গ বা utrasonic wave]

4. (d), 5. (b), 6. [(a, i), (b, j), (c, f) (d, h), (e, g)]

7. (b), 8. (a), 9. (a), 10. প্রায় 10^{10} gms/c'c অর্থাৎ এক ঘন সেণ্টিমিটার আয়তনে যতগুলি ইলেকট্রন কণিকা ধরে বা স্থান পায় তার ভর প্রায় এক কোটি কিলোগ্রাম।

11. (f), 12. (b)

---

17 যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কল-61

ভারতীয় ডাকটিকিটে বিজ্ঞানী

প্রবীরকুমার লাহা

স্কুলের রচনায় লিখতে হয় প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের অবদান। আজকের সভ্যতাকে বিজ্ঞান ছাড়া ভাবা যায় না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিজ্ঞানের দান রয়েছে। বিজ্ঞান গড়ে এক উন্নত মানব সম্পদ। তৈরি করে যুক্তিশীল মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা অনেক, বিজ্ঞান সীমানার গণ্ডি এক জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি। ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। জন্ম হচ্ছে বিজ্ঞান সাধকের সাধনায় নতুন নতুন বিজ্ঞান—সমাজ বিজ্ঞান, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান প্রভৃতি আরো অনেক নব নব বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের উৎপত্তি স্থান নিয়ে নানা মুনির নানা মত। একদল বলেন বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থান সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে অর্থাৎ বিদেশের পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান চর্চার ধারা ছিল, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পৃষ্ঠায় অনেক নজীর আছে। নাম পাওয়া যায় বরাহমিহির, আর্যভট্ট প্রমুখ অনেক বিজ্ঞানীর। বললে ভুল হবে না আজকের বিজ্ঞানের এঁরা আদি জনক ও বিজ্ঞানভাবনার পথিকৃৎ। ঢাক ঢোল প্রচারের অভাবে এঁরা জগত সভায় আসন তেমন স্থান পান নি। প্রতিভায় এঁরা কেউই কম ছিলেন না, দিক্‌পাল না হলেও সেই যুগে সেই সময়ে তাঁদের প্রতিভায় এক স্বীকৃতি ছিল রাজসভায়। প্রাচীন ভারতের মন্দির ও অন্যান্য শিল্পকলায়, ভাস্কর্য—স্থাপত্য, ঝারুকার্যে পৃথিবীর যে কোন শিল্পের সমকক্ষ, কুশলী শিল্পীরাও পৃথিবীর যে কোন শিল্পীর থেকে কম প্রতিভার পরিচয় দেন নি।

ডাকটিকিট প্রকাশ, ব্যবহার ও সংগ্রহ আধুনিক সভ্যতার এক অঙ্গ। ডাকটিকিট প্রচলনের দিকও বহুমুখী—সখ, শিক্ষামূলক ও ব্যবসায়িক।

দেশ বিদেশের ডাক কর্তৃপক্ষ তাই ডাকটিকিটকে বেছে নিয়েছেন স্মারক হিসাবে। ডাকটিকিট ধরে রেখেছে দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি। ভারতের ডাক কর্তৃপক্ষও এসব অনুসরণ করেছেন। তাঁরা বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ডাকটিকিট প্রকাশ করে চলেছেন। ভারতের প্রথম বিজ্ঞানী ডাকটিকিট প্রকাশ পায় 1958 সালের 30 নভেম্বর। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র জগদীশ বসু। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান স্নাতক। অধ্যাপনা কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। নির্ভীক অধ্যাপক। স্থপতি কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের। গবেষক বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব বিশ্ববন্দিত ও স্বীকৃত। প্রথমে পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণারত ছিলেন, বেতার যন্ত্রের প্রাথমিক সূত্রের আবিষ্কারক। পরে জড় ও জীবে সাড়ার (উদ্ভিদ) আবিষ্কারে বিশ্ববিজ্ঞানের এক নব শাখার দুয়ার খুলে গেল। কবি সত্যেন দত্তের কবিতার সুরে ধ্বনিত হয়েছে—"তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জয়ের পেয়ে সাড়া, আমাদের এই নবীন সাধনা শব সাধনার বাড়া।" জগদীশ বসু রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। জগদীশ বসু বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও বঙ্গ সাহিত্যে পদচালনা করেছেন—একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বাংলা ভাষায় বুননিতে, বিজ্ঞান রচনায় ছিলেন পারদর্শী শিল্পী। 'অব্যক্ত' রচনা বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ।

স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় দশকে ডাক কর্তৃপক্ষ ডাক-টিকিটের ডালিতে 5টি বিজ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট সাজিয়েছেন।

1960 সালের 15 সেপ্টেম্বর ভারতগৌরব DR. M. VISVESVARAYA জীবিত থেকে একশ বছর বয়সে পদার্পণ করল। প্রকাশিত হল বাদামী ও গাঢ় লোহিত বর্ণের ডাকটিকিটে চিহ্নিত হল তাঁর প্রতিকৃতি। বিশ্বেশ্বরাইয়া ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, আজকের কর্ণাটক রাজ্যের স্থপতি। কৃষ্ণ সাগর বাঁধের পরিকল্পনাকার ও রূপকার। তাঁর জীবনাসান ঘটে 1961 সালে। ভারতীয় ডাকটিকিটে জীবিত ব্যক্তির ডাকটিকিট প্রকাশে তিনি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। প্রথম স্থানাধিকারী হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কেশর কার্ভের।

2. 8. 1951 তারিখে প্রকাশিত হল বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মশতবর্ষ স্মরণে স্মারক ডাকটিকিট। ধূসর রঙের ডাকটিকিটে চিত্রিত হল তাঁর প্রতিচ্ছবি। রসায়নশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস.-সি। সে সময়ে এ গৌরব অর্জনাধিকারীতো তিনি ছিলেন দ্বিতীয় জন, প্রথম জন সরোজিনী নাইডুর পিতা

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের অধ্যাপনা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বৈজ্ঞানিক মহলে ধারণা ছিল পারদ ও নাইট্রেট দুটি রাসায়নিক পদার্থ বি-ষম পদার্থ অর্থাৎ দুটি পদার্থ মিশে যায় না। কিন্তু তিনি দুটি পদার্থ মিশাবার কৌশল আবিষ্কার করে এ ধারণাকে ভুল প্রমাণ করলেন। সাড়া পড়ে গেল দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী মহলে। ছড়িয়ে পড়ল তাঁর যশখ্যাতি।

কবি সত্যেন দত্তের সুরঝংকারের ছন্দে—"বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া, মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া। তাঁর স্বপ্ন ছিল ঘরে ঘরে অসংখ্য বিজ্ঞানী সৃষ্টি হক। সে স্বপ্ন আজ সফল। বাণিজ্যে বসত লক্ষ্মী প্রবাদকে তিনি বাস্তব করেছিলেন। বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য সাধনা করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ নামে কারখানা। 1922 সালের খুলনার ভীষণ দুর্ভিক্ষে তাঁর ত্রাণকার্য উল্লেখ-যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বস্তু জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মন ব্যক্ত করেছেন, বিকাশশক্তি ও বোধশক্তিকে ব্যক্ত করেছেন।"

বঙ্গ সাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্রের 'হিন্দু কেমিস্ট্রী' বইটি অনবদ্য। শ্রীনিবাস রামানুজন একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ্, গণিতশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। তিনি দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা, জীবনের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র 33 বছর। কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর প্রতিভার শত পুষ্প বিকশিত হয়েছিল। জন্ম 1887 জীবনাবাসন 1920।

তাঁকে অধ্যাপক Julian Huxley শতাব্দীর গণিতজ্ঞ বলেছেন।

ভারতীয় ডাক কর্তৃপক্ষ উপহার দিল গাঢ় কালো রঙের ডাকটিকিট, চিত্রিত তাঁরই ছবি।

1964 সালের 16মে প্রকাশ পেল এক লাল বাদামী রঙের ডাকটিকিট—বোম্বাই-এর ব্যাকটেরিওলজির ল্যাবরেটরি Haffking Institute.এর প্রতিষ্ঠাতা Dr. Waldemar Mordeoa Wolff Haffking I04 তম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে। তাঁর জন্ম 16. 3. 1860 ও মৃত্যু 26. 10. 1930।

এদেশের পরমাণু বিজ্ঞানের সাফল্য এশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে—এ সাফল্যের নায়ক হলেন বিজ্ঞানে অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। ডঃ ভাবার জন্ম 1909, বোমাইয়ের পড়া-শুনা শেষ করার পর, তিনি Gonville ও কেম্ব্রিজের Caius কলেজে যোগ দিয়ে সেখান থেকে সি. এ. ও পরে Ph. D. ডিগ্রী পান।

ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। অংক সহ মেকানিক্যাল বিজ্ঞানে অনার্সে প্রথম শ্রেণী পান। লাভ করেন অংকে Rouse Ball Travelling Studentship. বিজ্ঞানে Cosmic Radiation, the theory of elementary particles and the quantam theory ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান অনস্বীকার্য। তিনি প্রতিভার স্বীকৃতিতে মাত্র 31 বছর বয়সে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ভূষিত হন এডাম ও Hopkins পুরস্কার ও পদ্মভূষণে (1954), ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (1951) ও কেম্ব্রিজে সাম্মানিক ফেলোর পদ অলংকৃত করেন। বিশ্ববিজ্ঞান আঙিনায় তাঁর নাম প্রথম সারিতে।

ছাত্র জীবনের সাফল্য ধারাকে তিনি তাঁর কর্মজীবনেও প্রবাহিত করেছেন! 1945-এ টাটা ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট রিসার্চের প্রথম অধিকর্তা, 1948 সালে ভারতীয় পরমাণু কমিশনের সভাপতি, 1957 ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি বিভাগের সচিব, পরে ট্রম্বের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা।

বিশ্ববিজ্ঞান আঙিনায় ডঃ ভাবার নাম উজ্জ্বলময়। ভাবার স্বপ্ন আজ সফল। 1974 সালে ভারত প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণ করেন। ভারত পরমাণু শক্তিকে শান্তি ও মানব কল্যাণে লাগাবে ঘোষণা করেছেন।

ভারতের পরমাণু প্রকল্পের স্থপতি ডঃ ভাবার 24.1. 1966 তারিখে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়!

তাঁকে ডাক বিভাগ স্মরণ করেছেন গাঢ় বেগুনী রঙের ডাকটিকিটে; চিত্রিত তাঁর ছবি ও পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র।

70 দশকে ডাকবিভাগ ৯টি বিজ্ঞানী ডাক টিকিট প্রকাশ করে।

প্রথম উপহার দেন 1971 সালে বিশ্বশ্রুত বিজ্ঞানী ও 1930-এর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন স্মরণে কমলা ও গাঢ় বাদামী ডাকটিকিটে। তাঁর জন্ম 7.11.1888 ও মৃত্যু 21. 11. 1970 তাঁর পদার্থবিজ্ঞানে রশ্মি সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার ফল বিশ্ববিজ্ঞানে এক নব দিগন্ত উন্মোচন করে, নাম রমন রশ্মি। ভারতে ও বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে তিনি প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্মানের অধিকারী। বাঙ্গালোর রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

ভারতের মহাকাশ গবেষণার পথিকৃৎ হলেন ডঃ বিক্রম এ. সারাভাই। 1971 এর শেষে তিনি চলে গেলেন। তাঁরই পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত ত্রিবান্দ্রমে Thumaecatorial Rocket উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তাঁরই স্মৃতিকে মনে করায়।

ডাক বিভাগ ডাকটিকিটে শ্রদ্ধাঞ্জলিতে অর্পণ করেছে তাঁর প্রতি, ডাকটিকিটের নক্সায় ডঃ সারাভাই-এর ও

রকেট উৎক্ষেপণের ছবি। রঙ বাদামী ও সবুজ।

1973 সালে প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞানী ডাকটিকিট।

একটি Dr. G. Armauer Hasen ইনি Norwegian বিজ্ঞানী ও কুষ্ঠর বীজাণু আবিষ্কারক। এ আবিষ্কারে শতবর্ষে লাল বাদামী রঙের ডাকটিকিট চিত্রিত হল গবেষণারত Dr. Hasen.

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের দীপ্ত প্রতিভাধর হলেন পোলিশ গবেষক, ব্রহ্মাণ্ডের স্পর্শকেন্দ্র সম্বন্ধীয় স্রষ্টা, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, অর্থনীতিজ্ঞ ও পদার্থবিদ, নিকোলাস কোপারনিকাস। জন্ম 1473.

Cracow, Bologna, Pudua ও Ferrar বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করে 1503 সালে তিনি পোল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। বিশ্বশ্রুত তিনি ব্রহ্মাণ্ড সূর্যকেন্দ্র সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সম্পর্কে।

নিকোলাসও তাঁর তত্ত্বের ছবি চিত্রিত হল নীল ও লাল দ্বিবর্ণের ডাকটিকিটে।

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে টেলিফোন, আবিষ্কারক আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল, জন্ম 1847 ও জীবনাবসান 1922। তিনি ভারতীয় ডাকটিকিটে কালো, হলুদ রঙে স্থান পেয়েছেন।

বেতারবাহী টেলিযোগাযোগ ও বেতারযন্ত্রের আবিষ্কারক হলেন Guglielmo Marconi, ইটালীর পদার্থবিজ্ঞানী। তিনিও ভারতীয় ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন।

1977 সালে ধ্বনি রেকর্ডের আবিষ্কারে শতবর্ষ পূর্ণ হল। এ আবিষ্কারে সামাজিক কাঠামো ও মানুষের জীবনধারণ ধরনে পরিবর্তন এল। এ সময়েই আবিষ্কৃত হয় রঙীন আলেকচিত্র পদ্ধতি। আবিষ্কারক ফরাসী কবি ও বুদ্ধিজীবী চার্লস Cors। প্যারিসের বিজ্ঞান একাডেমী প্রস্তাব দেন রেকর্ড ও রিপেলের মেসিন করার জন্য। তখন Emile Berliner রেকর্ডের ডাইস পদ্ধতি বের করেন। তাঁকে বলা হয় রেকর্ড ডাইস পদ্ধতির জনক।

1893তে আবিষ্কৃত ফনোগ্রাম যন্ত্রটি প্রথম জনগণের কাছে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়। ডাকটিকিটে চিত্রিত হল গেরুয়া ও কালো রঙের পুরাতন মডেলের ফলোগ্রাম যন্ত্রটি।

1979তে ডাক বিভাগ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করল সেই বিশ্বশ্রুত পদার্থ ও গণিতবিদ্ এবং মানবদরদী আলবার্ট আইনস্টাইন স্মরণে। প্রকাশিত হল তার জন্মশত বর্ষ উপলক্ষে কালো রঙের ডাকটিকিট, চিত্রিত ভাবনারত মহান বিজ্ঞানী। আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রণেতা ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইনস্টাইনের জন্ম জার্মানীতে হলেও 1940 থেকে তিনি আমেরিকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর জীবনাসান ঘটে 18.4.1955.

1879তে আবিষ্কৃত হল সভ্যতার অন্যতম উজ্জ্বলতম আবিষ্কার বৈদ্যুতিক বাল্ব, সময় 21.10.1879. আবিষ্কারক টমাস এলভা এডিসন। আবিষ্কারের স্থান আমেরিকার New Jeiseya Nelso Park তাঁর গবেষণাগারে। এই আবিষ্কারে সমাজে পরিবর্তন এল।

শতবর্ষের স্মরণে চিত্রিত হল লাল বেগুনী রঙের ডাক টিকিটে বিদ্যুতিক Bulb-এর পুরাতন ও নতুন মডেল।

1882তে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন জার্মান জীবাণু বিজ্ঞানী Dr. Robert Koch তাঁর গবেষণারত অবস্থার ছবি ভারতীয় ডাকটিকিটে চিত্রিত হয়েছে, ডাকটিকিট দ্বিবর্ণের—লাল ও বেগুনী।

এখনও দেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞানী ভারতীয় ডাকটিকিটে স্থান পাননি, প্রত্যাশা নিশ্চয়ই ডাক কর্তৃপক্ষ অসম্পূর্ণ রাখবেন না।

3, স্যাকড়া পাড়া লেন, কলিকাতা-12

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

অর্দ্ধশত মডেলের নির্মাণ প্রণালী ও সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ১০৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

বেশ তো! আমাদের ১১,০০০ ইঞ্জিনের মধ্যে বেছে নাও কোনটি তোমার পছন্দ; —এদের মধ্যে ৮,০০০ টিরও বেশি হল স্টীম ইঞ্জিন, ২,০০০-এর কিছু বেশি ডিজেল আর প্রায় ১,০০০ হল বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন। এছাড়াও রয়েছে কয়েকশ 'এমু' কোচ। এখন সারা দেশ জুড়ে ৭৫,০০০ কিমি রেলপথে ৭,০০০-এরও বেশি স্টেশন আছে। তুমি যখন বড় হবে তখন দেখবে স্টেশনের সংখ্যা আরও কত বেড়ে গেছে; বেড়ে গেছে রেলপথের দৈর্ঘ। তাছাড়া, তখন আরও দ্রুতগামী ডিজেল আর বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যাবে। জানো কি এইসব ইঞ্জিন এখন এ দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং কিছু কিছু রপ্তানীও করছি আমরা।

কিন্তু শুধু রেলগাড়ী চালাবে কেন, সারা রেলওয়েকে চালানোর দায়িত্বও একদিন তোমাদের হাতে এসে পড়বে। দেশকে আরো দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এ তো তোমাদেরই কাজ! তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠ—দেখবে কত মজার কাজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

পূর্ব রেলওয়ে

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

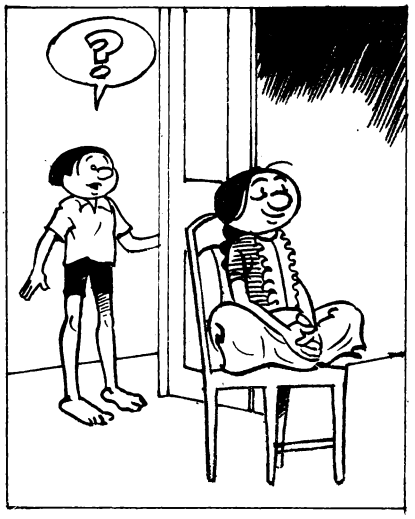

ফ্যানটাসস্টিক্!
সরি, বলতে ভুলে গেছি – আসতে বোস। নইলে জাম্প্ করবি।
জাম্প তো করবেই। তবেই না বসে আরাম। পেরিফেরা এমনই জিনিস।
পেরিফেরা? না তো!
না তো কি! বসে বুঝতে পারছিস না?
আলতু ফালতু বকিসনি! প্রত্যেকটা চেয়ারে দামী স্পঞ্জের গদি লাগানো আছে।
মুখ্যু। এই স্পঞ্জই হল পেরিফেরা পর্বের প্রাণী।
স্পঞ্জ আবার প্রাণী হল কবে থেকে!
আজ্ঞে হ্যাঁ। আগে লোকে একে উদ্ভিদ বলেই জানতো, পরে জানা গেল স্পঞ্জ জলজ প্রাণী।
স্পঞ্জ যে প্রাণী, এটা তুই কবে আবিষ্কার করলি?
এটা আমার নয়। বৈজ্ঞানিকেরাই এটা আবিষ্কার করেছে।
বলে কি! আমি তো একবার স্পঞ্জ চিবিয়ে খেয়ে দেখেছিলুম, ইস, কি বিচ্ছিরি খেতে! প্রাণের নাম গন্ধ নেই উল্টে, বদ গন্ধ!

এদের মুখ পেট বলে নির্দিষ্ট কিছু নেই, আছে অসংখ্য ছিদ্র। ঐ ছিদ্র পথে জলের সঙ্গে নানা জৈবিক পদার্থ ও অক্সিজেন টেনে নেয় এবং ভিতরের বর্জ্য পদার্থ সহ ঐ জল আবার ছেড়ে দেয়। এই ভাবে এরা বেঁচে থাকে।
এদেরও একটা জীবন চক্র আছে। স্পঞ্জরা ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা হয়।
সত্যি ?
তুই বরং এক টুকরো স্পঞ্জ জোগাড় করে মিলিয়ে নিস। আমি এখন চললুম।
স্পঞ্জের ডিম—কেমন খেতে, কে জানে!
খুদের কথা যদি সত্যি হয়, তো এখুনি ওগুলো বিদেয় করতে হবে!
দাদু—এখুনি ঐ চেয়ারগুলো ফেরত দিয়ে তুলো বা ছোবড়ার গদিওয়ালা চেয়ার নিয়ে এসো।
অ্যাঁঃ! কেন? স্পঞ্জের অমন সুন্দর গদি—তোর ভাল লাগছে না!
তুমি জানো ঐ স্পঞ্জ জিনিসটা কি? কোথায় পাওয়া যায়?
হ্যাঁ! স্পঞ্জ আসলে একটি জলজ প্রাণী, এ তো সকলেই জানে।
তাহলে অন্যান্য প্রাণীদের মতই এদের জীবন প্রণালী?
কিছুটা সেই রকমই। তবে এরা অমেরুদণ্ডী এবং কারো ক্ষতি করে না।

তুমি জেনে শুনে এটা করেছ ?
এতে আর জানা শোনার কি আছে রে— হিঃ-হিঃ-হিঃ! হেঃ-হেঃ-হেঃ!!

ওরে পুঁটি তুই যা ভেবেছিস, তা নয়! এগুলো কৃত্রিম উপায়ে রবার ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। আগে অবশ্য ঐ সামুদ্রিক স্পাঞ্জই ব্যবহার হতো আর এগুলো নানা আকৃতির হয়। সমুদ্রজাত স্পাঞ্জ যেমন নরম মোলায়েম তেমনি দামী।

বর্তমানে কৃত্রিম স্পাঞ্জ কোন অংশে কম নয়—দামেও সস্তা। তোর যখন স্পাঞ্জ পছন্দ নয়, তখন ছোকড়া দেওয়া চেয়ারই একটা এনে দেবো।
না-না, আমার ঐ স্পাঞ্জই ভাল

ঐ তো আমার চেয়ার!
ওম্মাঁ-আঁ!

কি হলো! নিশ্চয় চেয়ার থেকে স্প্রিং করেছিস? অমন লাফিয়ে বসলে ওটা তো লাফাবেই, স্পাঞ্জ যে!
উপস্!

বুঝেছি, তোর ছোকড়াই ভাল!
না-আ-আ-আ!
বোকা মেয়ে- কোথাকার!

নীলবিদ্রোহ ও কৃত্রিম নীল আবিষ্কার

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতি বর্ণময়। চোখ খুললেই দেখা যায় নীল আকাশ, হরিৎ বনানী আর অসংখ্য বর্ণে রঞ্জিত ফুল-পাখি।

রঙের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। তাহলেও রঙ ছিল একদা একান্তই প্রকৃতির সম্পদ। নিজের অঙ্গবাসটুকু রঞ্জিত করার সামান্য বিদ্যাও ছিল মানুষের অনায়ত্ত।

প্রকৃতির রঙকে সর্বপ্রথম নিজের কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেন মিশরীয়রা। খ্রীস্টপূর্ব সাতাশশো শতাব্দীতে দেখা যায় মিশরের মানুষেরা এক রকম রঙে কাপড় ছোপাতে শুরু করেছে। রঙটার নাম নীল। খ্রীস্টজন্মের পাঁচশো বছর আগে ভারতের পাণিনির লেখাতেও নীলের উল্লেখ আছে। নীল রঙের উৎস এক ধরনের গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম, ইণ্ডিগোফেরা টিংকটোরিয়া। গাছের মধ্যে 'ইণ্ডিক্যান' নামক এক যৌগিক পদার্থ থাকে। পদার্থটি বর্ণহীন। কিন্তু গোটা নীল গাছকে কেটে যখন চৌবাচ্চার জলে পচতে দেওয়া হয় তখন ইণ্ডিক্যান আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে 'ইণ্ডক্সল' নামক অন্য একটি বর্ণহীন যৌগে পরিণত হয়। তারপর চৌবাচ্চার জলে চুন দিয়ে বাতাস প্রবাহিত করলে ইণ্ডক্সিল বাতাসের অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয়ে 'ইণ্ডগোটিন' বলে একটা রঙীন পদার্থ সৃষ্টি করে। ওই রঙীন পদার্থকেই আমরা চলতি কথায় নীল বা ইণ্ডিগো বলি।

1856 খ্রীস্টাব্দে বৃটেনে পার্কিন কর্তৃক সংশ্লেষিত রং 'মভ' আবিষ্কারের আগে জামাকাপড় রং করার জন্য পৃথিবী জুড়ে ব্যবহৃত হতো এই নীল। দেশ বিদেশের বাজারে নীলের চাহিদা ছিল প্রচুর। আর ভারতের জলমাটি ছিল নীলগাছ চাষের পক্ষে প্রভূত উপযোগী। ফলে বাংলা-বিহার উত্তরপ্রদেশে ব্যাপকভাবে চাষ হতো নীলগাছের। বৃটিশ নীলকর সাহেবরা সেই নীলগাছ কিনে তা থেকে তৈরি করতো নীল। নীল তৈরির কারখানা বা নীল কুঠিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল সারা দেশ। এক হিসেবে দেখা যায় 1897 খ্রীস্টাব্দে আড়াই লক্ষ একর জমিতে নীলের চাষ হয়েছিল এবং সেই নীল রপ্তানী করে নীলকর সাহেবেরা সত্তর লক্ষ টাকা আয় করেছিল। গত শতাব্দীর শেষের দিকে নীল ব্যবসায়ে লাভের মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে সাহেবদের লোভের মাত্রাও বেড়ে যায়। তারা কৃষকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে সামান্য অর্থের বিনিময়ে কখনও বা মাগনায় কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করতে থাকে। ফলে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়। সে আন্দোলনে কৃষকদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে গোটা দেশ। তদানীন্তন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী দীনবন্ধু মিত্র অসহায় কৃষকদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারকে বিষয়বস্তু করে 'নীলদর্পণ' নাটক লেখেন।

কিন্তু নীলকুঠি বন্ধ হয়েছিল জার্মানীতে কতিপয় বিজ্ঞানীর নীল সংশ্লেষণের সহজসাধ্য পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলেই।

নীল নিয়ে রসায়ন বিজ্ঞানীদের গবেষণা আদ্যিকালের। সেই গবেষণা করতে করতেই জানা গিয়েছিল যে ইণ্ডিগোটিনকে নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা জারিত করলে 'আইসাটিন' নামক এক যৌগে পরিণত হয়। পরে দেখা যায় আইসাটিন ডাইকিটো ইনডোলি নামক একটি পূর্ব পরিচিত যৌগ। 1878 খ্রীস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ফন বেয়ার এই আইসাটিন থেকেই প্রথম ইণ্ডিগোটিন সংশ্লেষিত করেন তিনটি সহজ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। এরপর 1880 ও 1882 খ্রীস্টাব্দে তিনি নীল সংশ্লেষণের আরও দুটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কিন্তু এইসব পদ্ধতিতে নীলের সংশ্লেষণ প্রচুর ব্যয়সাধ্য ছিল। ফলতঃ সংশ্লেষিত নীলের পক্ষে প্রকৃতিজাত নীলের বাজার দখল করা সম্ভব ছিল না। 1886 খৃস্টাব্দে নোয়েল্টিং নামক এক বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেন যে সংশ্লেষিত নীল কখনও প্রাকৃতিক নীলকে প্রতিস্থাপিত করতে পারবে না।

কিন্তু 1893 খ্রীস্টাব্দে এক রসায়নাগারে ঘটলো এক দুর্ঘটনা। এক বিজ্ঞানী আলকাতরাজাত সহজলভ্য ন্যাপথ্যালিনের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড উত্তপ্ত করছিলেন, হঠাৎ তাপমাত্রা দেখার থার্মোমিটারটা কিভাবে ভেঙ্গে গেল। থার্মোমিটারের পারদ পড়ে গেল ন্যাপথ্যালিন ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের মধ্যে। ফলে বিস্ময়করভাবে

ন্যাপথ্যালিন অতি দ্রুত থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড নামক অন্য একটি যৌগে পরিণত হয়ে গেল। এই দুর্ঘটনাজাত আবিষ্কারের ফলে একদা দুর্মূল্য থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইডের বাজারদর দারুণভাবে কমে গেল।

এই ঘটনার তিন বছর পরে জার্মান বিজ্ঞানী হিউম্যান অ্যানথ্রানালিক অ্যাসিড নামক এক যৌগ থেকে নীল সংশ্লেষণের এক সহজসাধ্য পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। ওই পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়ে উঠলো। তার কারণ, পূর্বোক্ত থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড থেকে দুটি মাত্র সহজ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সহজেই পাওয়া যায় অ্যানথ্রানালিক অ্যাসিড – যা হিউম্যানের পদ্ধতির প্রধান কাঁচামাল।

হিউম্যানের এই পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত নীল ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নীলের বাজার দখল করতে শুরু করলো। ফলে অলাভজনক হয়ে উঠলো প্রাকৃতিক নীলের চাষবাস। এই-ভাবে সুদূর জার্মানীর গবেষণাগারে বিজ্ঞানীদের বহু বর্ষব্যাপী গবেষণার ফলে বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই একে একে বন্ধ হতে লাগলো নীলকুঠিগুলি। অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে চিরজন্মের মত রেহাই পেয়ে গেল বাংলা-বিহার উত্তর প্রদেশের অগণিত অত্যাচারিত কৃষিজীবী!

অধ্যাপক বারাসত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়।

চেনা-অচেনা গাছপালা

বট

সুব্রত চৌধুরী

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেবের নামের সঙ্গে বোধি-বৃক্ষের নামও এসে যায়। বোধিবৃক্ষ হল একটি বট গাছ।

বটের বৈজ্ঞানিক নাম Ficus Bengalensis। বট গাছ স্থলজ, কাষ্ঠল, বহুপত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষ। ইহা বহু-বর্ষজীবী। এ গাছের নির্দিষ্ট আকৃতি নেই। এ গাছ মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আঁটকে থাকে। একটু বড় হওয়ার পর বট গাছের প্রধান কাণ্ডের শীর্ষমুকুলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য এই গাছ বেশি দীর্ঘ হয় না। কিন্তু শাখা মুকুলের বৃদ্ধি হয় বলে এর শাখা-প্রশাখা দ্রুত বাড়তে থাকে। কাণ্ড থেকে শাখা ও তা থেকে বহু শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই পরিণত একটা বট গাছকে দূর থেকে গম্বুজের মত দেখায়।

বট একটি স্বভোজী (Autophyte) উদ্ভিদ্। অর্থাৎ এ গাছ মাটি থেকে শোষিত দ্রবীভূত খনিজ লবণসহ জল এবং বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ নিয়ে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করে। এদের এই পুষ্টি পদ্ধতি অটোট্রফিক নিউট্রিশান (Autotrophic Nutri tion) নামে পরিচিত।

বট গাছ হল সপুষ্পক বা ফ্যানারোগ্যামস্ উদ্ভিদ (Flowing Plant)। বট গাছে এক ধরনের ফল হয়। কিন্তু এ ফল মানুষের খাবার উপযোগী নয়। তবে পাখিরা এ ফল খায়। বট ফল হল যৌগিক বা মালটিপল (Multiple) ফল। যৌগিক ফল দু' রকমের হয়। যথা ঃ—(১) সাইকোনাস্ (Syconus) ; এবং (২) সোরো-সিস্ (Sorosis)। বট ফল হল সাইকোনাস্ গোত্রের ফল। এ গাছের ফুলের ইনফ্লোরেসেন্স্ থেকে বা সমগ্র পুষ্পমঞ্জরীটি ফলে রূপান্তরিত হয়।

বট গাছের মূলের রং বর্ণহীন-সাদা। এর মূলে শাখা ও প্রশাখামূল থাকে। এর মূলরোম এককোষী। বট গাছ প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন মাটি থেকে সংগৃহীত নাইট্রেট লবণ থেকেই সংগ্রহ করে। বটগাছের মূলের ডগায় মূলত্র স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। এদের বহুকোষী মূলত্র বা বহুযোজী মূলত্র (Multiple root cap) বলে।

বট গাছের কাণ্ড কিংবা শাখার পর্ব বা পর্বমধ্য থেকে এক ধরনের মূল উৎপন্ন হয়। এ ধরনের মূল অস্থানিক মূল বা কাণ্ডজ মূল True Adventitious root or cauline) নামে পরিচিত। বটের এই পরিবর্তিত মূলের নাম স্তম্ভমূল। যান্ত্রিক কার্য অর্থাৎ উদ্ভিদকে দৃঢ়তা বা শক্তি প্রদানের অর্থাৎ বটের শাখার কাণ্ডের ভার বহনের নিমিত্ত অস্থানিক মূলের এ ধরনের পরিবর্তন হয়।

বট গাছের ডাল বা পাতা ভাঙলে একপ্রকার হরিদ্রাভ বা দুধের মত সাদা পদার্থ বের হয়। এ হল বর্জ্য পদার্থ। এর নাম তরুক্ষীর (latex)। তরুক্ষীর হল নাইট্রোজেন-বিহীন রেচন পদার্থ। ক্ষীরকলা (Laticiferous tissue) নামের বিশিষ্ট কলার মধ্যে এ বর্জ্য পদার্থ থাকে। এ পদার্থ তিক্ত স্বাদের। তরুক্ষীর বিষাক্ত। এর দ্বারা বট গাছ আত্মরক্ষা করে। এ পদার্থ নালির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। বটের তরুক্ষীর মানুষের তেমন কোন কাজে আসে না।

বট কাষ্ঠল উদ্ভিদ হওয়া সত্ত্বেও এর কাঠ বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। তবে বট গাছ মানুষ এবং পশুপাখির নানা উপকার করে। এ গাছ রোদ বৃষ্টির হাত থেকে মানুষ এবং পশু-পাখিকুল রক্ষা করে! বটগাছের ছাল, ডালপালা ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ।

বিলাস চৌধুরী, 138, কৃষ্ণ সাধুখাঁ রোড, নৈহাটি, 24পরগনা।

মাইক্রোপ্রসেসর

1969 সালে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে আরো এক যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটলো। এতো দিন পর্যন্ত, কম্পিউটারের প্রধান গণনা কার্যের সার্কিট, যার নাম সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট্ (Central Processing Unit), সেটি তৈরি করা হতো অজস্র ট্রানজিস্টার, রেজিস্টর, জয়োড আর ক্যাপাস্টির ব্যবহার করে। এই যন্ত্রাংশগুলি লাগানো হতো একটি বোর্ডে, যার নাম ছিলো সার্কিট বোর্ড। ইন্টেল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা টেড্ হফ্ করলেন কি, ওই সার্কিট বোর্ডের পরিবর্তে যে সিলিকন টুকরো দিয়ে ট্রানজিস্টার বানানো হয়, সেই সিলিকন টুকরো বা চিপ্ (Chip) কেই সার্কিট বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে একটি ছোট সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বানিয়ে ফেললেন। ব্যাপারটি অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মতো। যে জিনিস দিয়ে ট্রানজিস্টার তৈরি হচ্ছে, সেই একই পদার্থের বোর্ড ব্যবহার করায় অনেকগুলি সুবিধা পাওয়া গেল এবং যে নতুন জিনিসটি তৈরি হলো, তার নাম দেওয়া হলো মাইক্রোপ্রসেসর। পুরানো সার্কিট বোর্ডের থেকে মাইক্রোপ্রসেসরের সব থেকে বড় সুবিধেগুলি হলঃ—

(1) একটি দশ ফুট বাই দশ ফুট বড় সার্কিট বোর্ডে যা সার্কিট তৈরি করা যায়, তা অনায়াসে একটি পাঁচ সেন্টিমিটার × পাঁচ সেন্টিমিটার আকারের সিলিকনের ওপর বানিয়ে ফেলা যায়।

(2) সিলিকন চিপ্, যার ওপর পুরো সার্কিটটি তৈরি, তার আকার এতো ছোটো হওয়ার জন্য বিদ্যুৎ সংকেতকে দশ ফুট বাই দশ ফুট সার্কিট বোর্ডের তুলনায় অনেক কম পথ চলতে হয়। তাই মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ সংকেত অনেক দ্রুত যাতায়াত করতে পারে।

(3) মাইক্রোপ্রসেসরের বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা অত্যন্ত কম।

(4) সিলিকন চিপে কোনো সোল্ডার করা সংযোগ না থাকার জন্য এটির নির্ভরযোগ্যতা সার্কিটবোর্ডের থেকে বেশি।

যে পদ্ধতিতে বিশাল বিশাল সার্কিটকে অতি ক্ষুদ্রায়িত করে মাইক্রোপ্রসেসর বানানো হয় তার নাম ভেরিলার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Very large Scale Integration) বা সংক্ষেপে ভি. এল. এস. আই (V.L.S.I) প্রযুক্তি।

মজার ব্যাপার হলো টেড্ হফ্ কিন্তু কম্পিউটারে কাজে লাগবে ভেবে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করেননি। তাঁর তৈরি 4004 নামের পৃথিবীর প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়েছিল জাপানী একটি প্রতিষ্ঠানের ক্যালকুলেটর বানানোর জন্য। আধুনিক মাইক্রোপ্রসেসরের তুলনায় 4004 ছিলো নিতান্তই দুর্বল। তবে টেড্ হফ তাঁর কোম্পানী ইন্টেল থেকে 1971 সালে 8008 নামে দ্বিতীয় মাইক্রোপ্রসেসরটি বাজারে ছাড়লেন। এটির আবির্ভাবে ইলেক্ট্রনিক্স মহলে বেশ হইচই শুরু হলো। তবে তখনও এইসব মাইক্রোপ্রসেসরকে আমরা কম্পিউটার বলতে যে জিনিস বুঝি, ঠিক সেই কাজে ব্যবহার করা হতো না। এদের প্রয়োগ স্থল ছিলো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কণ্ট্রোলার (Industrial Controller) এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রক হিসেবে। ইন্টেলের দেখা দেখি পৃথিবীর বৃহত্তম আই সি নির্মাতা টেক্সাস ইন্সট্রুমেণ্টও তাঁদের নিজস্ব মাইক্রোপ্রসেসর বাজারে ছাড়লেন। 1974 সালে ইন্টেল থেকে 8080 মাইক্রোপ্রসেসর বাজারে ছাড়া হলো। এই মাইক্রোপ্রসেসরটি ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তিবিদ্দের কাছে আদর্শ এবং প্রাথমিক মাইক্রোপ্রসেসরের মডেল হিসেবে আজও সমাদৃত। 8080 র আবির্ভাবের পর, বিভিন্ন কোম্পানী মাইক্রোপ্রসেসরকে কম্পিউটারে ব্যবহার করার জন্য গবেষণা শুরু করলেন। শুরু হল আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির গোড়াপত্তন। মাইক্রোপ্রসেসরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখে সিলিকন ভ্যালির এবং জাপানের অন্যান্য বড় কোম্পানীরাও এই বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যেই হুবহু ইন্টেলের 8080 কিম্বা তার থেকে শক্তিশালী 8085A র মত মাইক্রোপ্রসেসর বানিয়ে অন্য কোম্পানীরা বাজারে ছেড়ে দিলেন। দাম কমতে লাগলো হু হু করে। 1974 এ 8080র বাজার দর ছিলো পাঁচ হাজার টাকা। আর আজ তার থেকে অনেক শক্তিশালী 8085A কলকাতার বাজারে পঞ্চাশ টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। এক সঙ্গে বেশি কিনলে দাম আরো কম! সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, যে ইন্টেল এই 8085 ডিজাইন করেছিল, সে নিজেই এই কম দামের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গেছে। এখন অনেক খুঁজলেও ইন্টেলের 8085 বাজারে মিলবে না। সেখানে জাপানের

ইলেক্ট্রনিক দানব নিপ্পন ইলেক্ট্রিক কোম্পানী বা সংক্ষেপে NECর তৈরি 8085 পাওয়া যাবে। কম্পিউটার প্রযুক্তিতে এই অন্যান্য উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলিকে সেকেণ্ড সোর্স (Second Source) বলা হয়। কম্পিউটার প্রযুক্তিকে বস্তুত 1980 থেকে বর্তমান পর্যন্ত এতো দ্রুতো এতো উন্নত করে তোলায় Second Source কোম্পানীদের বিরাট অবদান রয়েছে। পৃথিবীতে কম্পিউটার প্রযুক্তিই একমাত্র ব্যবসা, যেখানে প্রতি বছর দাম কমছে। যে কম্পিউটার আজ থেকে চার বছর আগে কলকাতায় দেড় লাখ টাকায় বিক্রি হতো, আজ তার দাম কমে আঠারো হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। ফলে এই ব্যবসায় নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আরো উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কম্পিউটার প্রযুক্তিতে অলস, কিম্বা নির্বোধ মানুষের কোনো স্থান নেই। যে যত চট্‌পটে, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী হবে, কাজই যার কাছে ধ্যান জ্ঞান হবে, কম্পিউটার শিল্পের দরজা তার জন্য খোলা। ব্যর্থতার জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তিতে আর কোনো স্থান নেই। তাই কম্পিউটার প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত লোকেদের হাবভাব সবই সাধারণ মানুষের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে যায়। তারা সাধারণ অন্যান্য জীবিকার মানুষের সঙ্গে ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না। এই নিয়ে বিস্তর সমস্যা আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে দেখা দিয়েছে। তার কিছু প্রতিফলন এদেশেও সত্যিকারের কম্পিউটার প্রযুক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত লোকেদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে প্রচণ্ড মানসিক চাপে অনেকেই ড্রাগের শিকার হচ্ছেন। কারুর বাড়িতে হচ্ছে পারিবারিক অশান্তি। এ সবই অত্যন্ত দ্রুত এবং পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার ফলশ্রুতি। তবে মনে রাখতে হবে এসব কেবলমাত্র যাঁরা কম্পিউটার প্রযুক্তি বা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাঁদের কথা। কিন্তু যাঁরা এণ্ড ইউজার (End user) অর্থাৎ কম্পিউটার ক্রেতা এবং ব্যবহারকারী, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এই শব্দগুলো মনে রেখো

ADA—একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা।

Ada Augustine Lady Lovelace—লর্ড বায়রনের মেয়ে, পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রোগ্রামার।

Analytical Engine চার্লস ব্যাবেজ পরিকল্পিত প্রথম যান্ত্রিক কম্পিউটার। এটি তৈরি অবশ্য সম্ভব হয়নি।

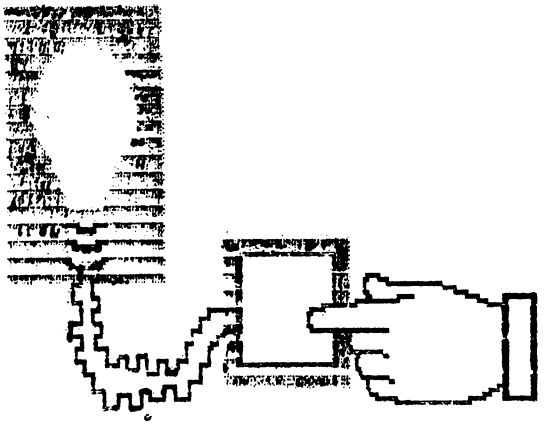

Charls Babbage—কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠাতা।

Harman Hollerith—পাঞ্চ কার্ড মেশিন নির্মাতা ও I. B. M. কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

Microprocessor—VLSI প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি কম্পিউটারের C.P.U.

C.P.U.—Central Processing Unit এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

Ted Hott—মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারক এবং Intel কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা।

Transistor—N এবং P ধরনের সিলিকন ব্যবহার করে তৈরি ছোট্ট ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ। এটি দ্রুত অন্ অফ্ হতে পারে এমন সুইচ্ হিসেবে কম্পিউটারের ব্যবহার করা হয়।

Second Source—কোনো যন্ত্রাংশের আসল আবিষ্কারক সংস্থা ছাড়া অন্য যে কোনো সংস্থা, যেটি সেই ধরনের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে থাকে।

Silicon—একটি মৌলিক পদার্থ। বৈদ্যুতিক ভাবে এটি অর্ধপরিবাহী অর্থাৎ Semiconductor। এটির সাহায্যেই বেশির ভাগ ট্রানজিস্টার, আই সি, মাইক্রোপ্রসেসর ইত্যাদি অ্যাকটিভ কম্পোনেন্ট (Activc Component) তৈরি করা হয়।

ব্যাপারটা প্রথম টের পেল অমল। মহাকাশযানে লম্বা পাড়ি দিয়ে যে বিজ্ঞানীর দল এই গ্রহে এসে পৌঁছেছে তাদেরই সর্বকনিষ্ঠ অভিযাত্রী বলা যায় অমল গুহকে। ওর বয়স মাত্র চব্বিশ অথচ এরই মধ্যে বিজ্ঞানচর্চায় সে যথেষ্ট সুনাম আর অভিজ্ঞতা লাভ করে সকলের নজর কেড়ে নিতে পেরেছে।

বেশ কিছুদিন ধরেই কয়েকজন বিজ্ঞানী মহাকাশে পাড়ি দিয়ে নতুন এক গ্রহে উপস্থিত হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই বিজ্ঞানীদলের প্রধান হলেন ডঃ অনুতোষ লাহিড়ী। ডঃ লাহিড়ী মহাকাশ গবেষণায় ভারতে একজন পথিকৃৎ। নানা গবেষণামূলক অভিযানে তিনি আগেও অংশ নিয়েছেন। বর্তমান এই অভিযান তারই চেষ্টা আর ইচ্ছার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

নতুন এই গ্রহের কথা ডঃ লাহিড়ীই প্রথম জগতকে জানান। এ গ্রহ তারই আবিষ্কার। ডঃ লাহিড়ীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল গ্রহটায় প্রাণের অস্তিত্ব আছে আর সেটা প্রমাণ করার জন্যই সাতজন বিজ্ঞানীর এই দল নিয়ে তিনি গ্রহটাতে পাড়ি জমিয়েছেন। দলটাকে প্রায় আন্তর্জাতিকই বলা যায়।

অমল গুহ অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ডঃ লাহিড়ীর। বয়স অল্প বলে অমলকে মোটেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে অভ্যস্ত নন ডঃ লাহিড়ী, বরং তার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্বই দিতে চান

তিনি। বেশ কয়েকটা ঘটনায় ডঃ লাহিড়ী বুঝতে পেরেছেন অমল ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত মানুষ হয়ে উঠবে, তাই বিপদসংকুল অভিযান হলেও তাকে প্রথমেই দলে নিয়েছেন।

প্রায় একপক্ষ কাল সময় পার হয়েছে এই গ্রহে দলটা পৌঁছনর পর। দলে যে সাতজন মানুষ রয়েছেন তারা হলেন ডঃ অনুতোষ লাহিড়ী আর অমল গুহ ছাড়া, একজন ইংরেজ মিঃ মার্টিন, ডঃ চিন্নাস্বামী, মিঃ তাকাহাসি নামে একজন জাপানী, সুজয় মিত্র, সেই মহাকাশযানের পাইলট আর চিকিৎসক হিসেবে ডঃ রণেন বোস।

ডঃ লাহিড়ী অভিযানে যাচ্ছেন শুনে মিঃ মার্টিন স্বেচ্ছায় সঙ্গী হয়েছিলেন। মহাকাশ অভিযানে তারও বেশ ভাল রকম অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাকাহাসিকে ডঃ লাহিড়ীই আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছেন।

নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে প্রায় পনেরো দিন আগে রওয়ানা হয় দলটি। শেষ পর্যন্ত মহাকাশযান নির্বিঘ্নে অবতরণও করে গ্রহটাতে। মহাকাশ-যানে প্রায় দুমাস থাকার মত খাদ্য আর ওষুধপত্র সঙ্গে আনাও হয়েছে। বিজ্ঞানী দল মহাকাশযানেই বাস করে চলেছে। পুরো গ্রহটা এখনও দেখা শেষ হয়নি। অবশ্য ডঃ লাহিড়ীর সেই অনুমান যে গ্রহটাতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, এখনও প্রমাণিত হয়নি। গ্রহে প্রাণের কোন চিহ্ন এখনও চোখে পড়েনি কারও।

গ্রহটাতে প্রাণের অস্তিত্ব টের পাওয়া না গেলেও একটা ব্যাপারে সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, আর সেটা হল গ্রহটায় অক্সিজেন রয়েছে অর্থাৎ প্রাণ সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া রয়েছে।

সেদিন সকালে সকালে যে যার কাজে ব্যস্ত ছিলেন মহাকাশযানের মধ্যে। অমল ওর নিজের ঘরে বসে কাজ করছিল। হঠাৎ ওর খেয়াল হল পাশেই রাখা কফির কাপ আর ডিম সেদ্ধ রাখা প্লেটটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভারি অবাক হয়ে অমল চারদিকে খোঁজ করতে লাগল। অদ্ভুত ব্যাপার। কোথায় উবে গেল কাপ প্লেটটা? কেউ কি ঠাট্টা করে সরিয়ে নিয়েছে? ভাবল অমল। কিন্তু সেটাই বা কি করে সম্ভব? কে আর এমন করবে?

অমল ডঃ চিন্নাস্বামীর ঘরে ঢুকতেই দেখল তিনি বেশ ক্রুদ্ধ।

অমলকে দেখে ডঃ চিন্নাস্বামী বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার দেখেছ অমল. আমার কফির কাপ আর ডিম কে যেন সরিয়েছে। খেতে গিয়ে দেখি পাশে নেই।

'বলেন কি? আমারও তো সেই অবস্থা। আমার কফি আর ডিম সেদ্ধ রাখা প্লেটটাও নেই।'

'বল কি? এ আবার কি ধরনের রসিকতা?'

'কিন্তু এমন রসিকতা কে করবে?' অমল বলল।

ইতিমধ্যে মিঃ মার্টন এসে দাঁড়ালেন!

'ভারি অবাক কাণ্ড ডঃ চিন্নাস্বামী, মহাকাশযান থেকে খাবার লোপাট হয়ে যাচ্ছে', মিঃ মার্টিন বললেন!

'কেন, আপনারও কফির কাপ অদৃশ্য নাকি?' অমল প্রশ্ন করল।

'আর বল কেন। তোমাদেরও কি একই হাল?'

'ঠিক তাই। ওই কথাই তো আলোচনা করছিলাম। ডানা মেলে তো কাপ প্লেট উড়ে যেতে পারে না।'

'তা বটে। কিন্তু আমরা কেউ এমন কাজ করব ভাবা যায়?'

এরপর সকলে এক জায়গায় সমবেত হওয়ায় আবার আলোচনাটা ওইখানেই বইতে শুরু করলো। প্রায় প্রত্যেকেরই কফির কাপ প্লেট উধাও হয়েছে। ব্যাপারটা যে কি কেউ বুঝে উঠতে পারল না।

ঘণ্টাখানেক পরে আরও অবাক কাণ্ড ঘটে গেল। দেখা গেল মহাকাশযানের প্রধান দরজার সামনে সব কটা কাপ প্লেট সাজানো রয়েছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রধানতঃ অমল। ও ছুটে গেল ডঃ লাহিড়ীর কাছে।

'স্যার, স্যার, দারুণ ব্যাপার ঘটে গেছে—', চেঁচিয়ে উঠল অমল।

'কি ব্যাপার, অমল?'

'স্যার, অদৃশ্য হওয়া কাপ প্লেটগুলো মহাকাশযানের দরজার কাছে পাওয়া গেছে—।'

'কিন্তু তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?' বললেন ডঃ লাহিড়ী।

'এর মাঝখানে দারুণ একটা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, স্যার। আমরা যা অনুমান করছিলাম সেটাই।'

'কি বলছ, অমল বুঝিয়ে বলতো।'

'স্যার, এই গ্রহে প্রাণী আছে আর তারাই মহাকাশযানে ঢুকে আমাদের কফির কাপ ইত্যাদি চুরি করেছে।'

'সেটা অসম্ভব কথা। আমরা কেউ তাদের দেখতে পেলাম না তা কখনও হয়?'

'সে কথাই বলতে চাই, স্যার। আমরা তাদের দেখতে পাব না।'

'মানে, কি বলছো, অমল?'

'স্যার, আমার সন্দেহ এ গ্রহে প্রাণী আছে আর তারা অদৃশ্য,' উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল অমল।

'কোন প্রমাণে এমন কথা বলছো?' ডঃ লাহিড়ী বললেন। 'কোন ভাবেই প্রাণের অস্তিত্ব আমরা টের পাইনি জানো নিশ্চয়ই?'

'তা জানি স্যার, কোন প্রমাণ মেলেনি। তবু আমার বিশ্বাস যা বলছি তা ঠিক। চলুন একবার গ্রহটা ভালো করে

দেখে আসা যাক।'

'কথাটা মন্দ বলনি, অমল। তবে, চলো সবাই বেরিয়ে পড়া যাক।

অমল অবশ্য ওর সন্দেহের বিষয় আর কাউকে বললো না। ডঃ লাহিড়ীও উচ্চবাচ্য করলেন না।

সবাই মহাক্যশযান ছেড়ে এবার বাইরে এসে দাঁড়াল। আবহাওয়া বেশ চমৎকার, কড়া রোদ ছড়িয়ে পড়েছে।

দলের সাতজন সদস্যই হাঁটতে শুরু করলেন। গ্রহটায় বেশ কিছু পাহাড়ঘেরা জায়গা চোখে পড়েছিল সকলেরই। গাছপালাও রয়েছে, কিন্তু প্রাণের অন্য কোন সাড়া এখনও পায়নি কেউ।

এবার অন্য দিকে দল বেঁধে চললেন সবাই।

কাছাকাছি একটা পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়াতেই সকলের চোখে পড়ল একটা আশ্চর্য দৃশ্য। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মত ধাপ বানিয়েছে কেউ! ধাপগুলো পরপর উপরে উঠে গিয়েছিল।

জাপানী বিজ্ঞানী তাকাহাসি বললেন, 'খুবই অদ্ভূত লাগছে, ডঃ লাহিড়ী। এই সিঁড়ি মানুষের মত কোন প্রাণী ছাড়া কেউ বানাতে পারে না! আমার ধারণা আপনার কথাই ঠিক, এখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বা ছিল। কিন্তু তারা গেল কোথায়?"

আচমকা কর্কশ একটা পাখির ডাকের মত আওয়াজে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। অথচ কেউই কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না। যেন ভৌতিক ব্যাপার।

অমল ডঃ লাহিড়ীর হাত চেপে ধরল হঠাৎ উত্তেজিত ভঙ্গীতে।

'কি হল, অমল? ও রকম করছ কেন?' ডঃ লাহিড়ীও উত্তেজিত।

'স্যার, আমার মনে হল আমার গায়ের কাছ দিয়ে কোন কিছু ডানা ঝাপটে চলে গেল। পরিষ্কার একটা হাওয়া আমার গায়ে লেগেছে।'

'ঠিক বলেছ, অমল, ব্যাপারটা আমিও টের পেয়েছি,' ডঃ চিন্নাস্বামী বলে উঠলেন। 'অথচ কিছুই চোখে পড়ল না।'

'চল, ধাপ বেয়ে ওপরে ওঠা যাক,' ডঃ লাহিড়ী বললেন।

সকলে একই সঙ্গে সেই পাহাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। বেশি উঁচু নয় পাহাড়টা, বড় জোর হাজার ফিটই হবে উচ্চতায়।

কিছুক্ষণ পরেই সকলে পাহাড়ের শীর্ষের কাছে পৌঁছে গেলেন। একটা আশ্চর্য দৃশ্য সকলের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল। শীর্ষদেশটার ঠিক নিচে চওড়া চাতালেরই মত। এক পাশে একটা মস্ত গুহা।

গুহার মধ্যে তাকিয়ে সকলে প্রায় স্তম্ভিত। কারও মুখেই কথা ফুটতে চাইছিল না।

গুহাটা লক্ষ্য করে কারোই বুঝতে অসুবিধা হল না যে সেটায় কোন প্রাণী বাস করে এবং সে প্রাণী নিঃসন্দেহে মানুষের মতই কোন প্রাণী। এরকম ধারণা হওয়ার কারণও ব্যাখ্যার দরকার হয় না যেহেতু মানুষের ব্যবহার্য বহু পদার্থই সেখানে রয়েছে।

গুহাটা ভাল করে পরীক্ষা করার পর দলের সকলেই নিশ্চিত হলেন গুহায় মানুষ জাতীয় প্রাণীর বাস আছে কিন্তু চারদিকে কোথাও কেউ ছিল না। বেশকিছু ফলমূল গুহায় দেখতে পেল সকলে। ওগুলো যে খাওয়ার উদ্দেশ্যেই কেউ রেখেছে তাতেও কোন সন্দেহ ছিল না।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন মিঃ মার্টিনই প্রথমে।

'ডঃ লাহিড়ী, এসব কি দেখছি? এই গ্রহটায় প্রাণীর বাস সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ আছে?'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু—' ডঃ লাহিড়ী কথা শেষ করার আগেই প্রায় কারও ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে কেউ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

অমল প্রায় ছুটে গিয়ে ডঃ লাহিড়ীকে টেনে তুলল।

'কি হল, স্যার ওভাবে পড়ে গেলেন কেন?'

'অমল, অমল, কেউ আমাকে ধাক্কা মেরেছে। ওই অট্টহাসি শুনেছো?'

'আমরাই আপনাকে ধাক্কা মেরেছি—; ডঃ লাহিড়ী' পাশেই ইংরাজীতে কারও কণ্ঠস্বর জেগে উঠতে সকলে চমকে উঠল।

'কে? কে আপনি?' ডঃ লাহিড়ী বললেন।

'আপনারা অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই', আবার কণ্ঠস্বর জেগে উঠল।' হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন, আমরা সম্পূর্ণ অদৃশ্য অবস্থাতেই আছি। আমাদের স্বচ্ছ এই দেহ আপনাদের চোখে অদৃশ্যই থাকবে। আপনারা আরও বোধ হয় ভাবছেন আপনাদের মহাকাশযান থেকে কফির কাপ প্লেট কোথায় হারিয়ে যায়? সেগুলো ফেরত পেয়ে বোধ হয় আরও বেশি অবাক হন। ওগুলো আমরাই নিয়েছিলাম। আজ তিনমাস ধরে এসব খাদ্য চোখে দেখিনি তাই—।'

'আপনাদের এ অবস্থা কি ভাবে হল?' ডঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করলেন।

'সে কথাই এবার বলছি। আমরা চারজন ইউরোপ থেকে মহাকাশযানে এই গ্রহে এসে উপস্থিত হই প্রায় পাঁচমাস আগে। আমরা এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত ছিলাম। শুধু জানতাম না এ গ্রহ অভিশপ্ত। মাস দুয়েক আগে হঠাৎ আবিষ্কার করি আমাদের শরীর স্বচ্ছ হয়ে আসতে শুরু করেছে। তারপর এক সময় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাই আমরা। এই গ্রহের সমস্ত প্রাণীই তাই—।'

কিন্তু কেন এরকম ঘটেছে? মিঃ মার্টিন জিজ্ঞাসা করলেন।

সম্ভবতঃ এখানকার খাদ্য, গাছপালা আর জলই এজন্য দায়ী। এগুলোর ভিতরের কোন অদ্ভুত রাসায়নিক পদার্থ প্রাণীর শরীরের সমস্ত তন্তুকে ওই অবস্থায় এনে ফেলে। আপনারাও এই অবস্থা প্রাপ্ত হবেন তাই বলছি আজই প্যরলে এ গ্রহ ছেড়ে ফিরে যান। আমরা আর ফিরতে পারব না। কারণ পৃথিবীর মানুষ আমাদের আর গ্রহণ করবে না', ব্যথাতুর হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। আমাদের জন্য আপনারা দুঃখ করবেন না।'

'এতোটা মুষড়ে পড়বেন না', ডঃ লাহিড়ী বললেন। 'আমাদের সঙ্গে আপনাদেরও ফিরে যেতে হবে। আশা করি পৃথিবীতে চিকিৎসার ফলে আবার আগের শরীর ফিরে পাবেন আপনারা। ডঃ বোস, কি বলেন?'

'অসম্ভব নয় এমন হওয়া', ডঃ রণেন বোস বললেন। 'উপায় একটা হবেই বিশ্বাস করি।'

'আপনাদের মহাকাশযানটা ঠিক অবস্থায় আছে?' ডঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করলেন।

'থাকলেও জ্বালানী নেই।'

'তাতে কিছু এসে যাবে না, আমাদের যানেই আপনাদের জায়গা হয়ে যাবে। আপনারা সকলেই এখানে আছেন কি?'

'হ্যাঁ, আমরা চারজনই আছি কিন্তু—', উত্তর ভেসে এল।

'কোন কিন্তু নেই এতে, আমরা আপনাদের চিরকালের জন্য এভাবে মৃত্যুর মুখে ফেলে যেতে পারি না', ডঃ লাহিড়ী বললেন।

'কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের কাহিনী কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।'

'সে দায়িত্ব আমাদের উপরেই ছেড়ে দিন। আমরা আপনাদের ভারতে নিয়ে যাব, আপনারা হবেন আমাদের অতিথি। আপনাদের চিকিৎসার দায়িত্ব আমরা সানন্দেই গ্রহণ করব। কি বলুন তাকাহাসি?'

'নিশ্চয়ই, এটাই তো মানুষের কাজ', মিঃ তাকাহাসি বললেন।

'তাহলে আগামীকালই আমরা পৃথিবীর দিকে রওয়ানা হব। এখানকার রহস্য আমরা জেনেছি, জেনেছি এ গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিন্তু যে অবস্থায় আছে সেটা বড় ভয়ংকর', ডঃ লাহিড়ীর গলা কেঁপে গেল। 'এমন হতে পারে আমরা কল্পনাতেও স্থান দিইনি।'

'আপনাদের ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই,' অদৃশ্য অভিযাত্রীদের একজন বললেন। 'আমরা কোনদিনই আশা রিনি আবার আমাদের প্রিয় পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে পারব। দুমাস আগে পৃথিবী থেকে আনা সব খাদ্য শেষ হওয়ার পর বাধ্য হয়ে এখানকার ফল মূল পাতা খেয়ে বেঁচে আছি আর শরীরের এই অবস্থা হয়েছে। আপনারা নিঃসন্দেহে ঈশ্বরপ্রেরিত।'

'আমরাও আপনাদের মত মানুষ।' মিঃ মার্টিন বললেন। 'তবে ভাগ্য ভাল বলে অমলই প্রথমে আপনাদের সম্পর্কে সন্দেহ করেছিল।'

'সব ভাল যার শেষ ভাল,' ডঃ লাহিড়ী বললেন। 'এবার তৈরি হওয়ার পালা। মহাকাশযান তৈরি রাখার ব্যবস্থা কর, সুজয়, কাল দুপুরের মধ্যেই আবার পৃথিবীর দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। এবার সকলে চলুন আমাদের মহাকাশযানে—'

159/1বি, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-25

স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিত্যসঙ্গী

Kanak

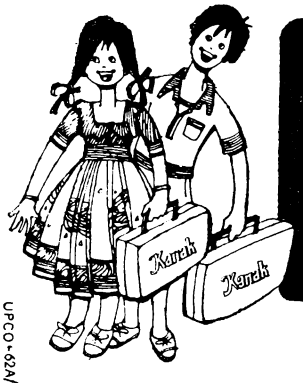

এলুমিনিয়াম স্কুল বক্স ও লাঞ্চ বক্স

UPCO-62A/82

প্রস্তুতকারকঃ

পি এল মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

কলিকাতা-৭০০ ০০৫

॥ পাঁচ ॥

দু'দিন পরে আমাদের জাহাজ যখন পোর্ট ব্লেয়ারের কাছাকাছি, তখন সমুদ্রের বুকে গভীর গাঢ় অন্ধকার। তাই জাহাজ আর জেটিতে ভিড়ল না, সারারাত জেটির বাইরেই নোঙর করে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকটা স্কুলের পড়া না বলতে পেরে বেনচিতে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রের মতো। আসলে আমাদের জাহাজের আজ সকলেই পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছবার কথা ছিল, কিন্তু সাইক্লোনের কবলে পড়ে আমাদের জাহাজ নির্ধারিত রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে ছিল বার্মার দিকে। তাই পৌঁছতে কিছুটা দেরি। জাহাজ থেকে দেখতে পেলাম রাতের পোর্ট ব্লেয়ার। উঁচু নিচু পাহাড়ী শহর। অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের মতো রাস্তা ও বাড়ির আলোগুলো জ্বলছে। রাতের পোর্ট ব্লেয়ার সত্যিই রোমাঞ্চ কর।

কিন্তু দিনের পোর্ট ব্লেয়ার আমাকে মুগ্ধ করল। জাহাজ থেকে জেটিতে নেমে চড়াই ভেঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে পৌঁছলাম দু নম্বর গেস্ট হাউসে। বনবিভাগের শংকর কাকা আমাদের জন্য জিপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, নিজে কী একটা কাজে আটকে পড়ায় আসতে পারেন নি। গেস্ট হাউসে আমাদের জন্য একটা ঘর রিজার্ভ করা ছিল। ডঃ শ্রীবাস্তব উঠলেন এক নম্বর গেস্ট হাউসে। কিন্তু জেটিতে নেমে মিঃ তলাপাত্র যে কোথায় ডুব দিলেন তা জানতেও পারলাম না। বোধ হয় নিজের যে আস্তানা আছে, সেখানেই গেলেন। আমরা ভেবেছিলাম, উনি যাওয়ার আগে নিজের ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন। কিন্তু অবাক হলাম, উনি যেন হঠাৎ বাতাসে কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেলেন।

দু'নম্বর গেস্ট হাউস একটু ছোট ও অপরিসর হলেও খারাপ নয়। দোতলা কাঠের বাড়ি, একতলায় মালপত্র থাকে। একপাশে একটা ডরমিটরি। কাঠের বাড়িতে দোতলায় আমাদের ঘর। একেবারে কোণার দিকে এক নম্বর ঘর আমাদের পক্ষে ভালোই। গেস্ট হাউসে টেলিফোনও আছে, দূরের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অসুবিধে হবে না।

গেস্ট হাউসের চৌকিদারের নাম অ্যালভি। কালো বেঁটে চেহারা। দক্ষিণী খ্রিস্টান। লোক ভালো। আর রান্নাও যে চমৎকার করে তার পরিচয় সেদিনই পেয়ে গেলাম। কাছাকাছি কোন ভালো হোটেল না থাকায় আমরা ওর রান্নাই খেতাম। শুধু আমরা নয় গেস্ট হাউসের অনেকেই ছিল ওর খদ্দের। অ্যালভির কাছেই প্রথম খেলাম সমুদ্রের সার্ডিন (তারিনী) আর হেরিং (মায়া) মাছ।

সেদিন দুপুরে খেতে খেতে আমাদের পাশের ঘরের প্রতিবেশীর সঙ্গেও পরিচয় হলো, নাম মিঃ সূর্য সোম। স্মার্ট লম্বা খুবই চালাক চতুর চৌকশ লোক। শুধু তাই নয়, ভদ্রলোক অনেকগুলি ভাষা জানেন, অনর্গল বলতেও পারেন। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের মধ্যেই হবে। কলকাতার কোন একটা বিদেশী ফার্মে নাকি বড় চাকরি করেন। মাসখানেকের জন্য অফিসের কী একটা কাজে এসেছেন। ভদ্রলোকের সুন্দর কথাবার্তায় আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

সৃজনকাকা বললেন, 'আমরাও দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছি। ঘুরে টুরে দেখব একটু এই আর কি!'

মিঃ সোম হাসলেন, ওর সুগঠিত পরিষ্কার সাদা দাঁতগুলি যেন হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বললেন, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে কী কাজ করেন আপনি? আই মিন, কোন অফিসে?'

এবার কাকাকে একটু বিব্রত মনে হলো, কারণ সমস্ত কথা খুলে বলার ইচ্ছেও নেই। তাই সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, 'এই একটু ব্যবসা ট্যাবসা—'

'তাই, কীসের ব্যবসা?' মিঃ সোমকে ব্যবসায় বেশ উৎসাহী মনে হলো।

খুব গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন কাকা, ইমপোর্ট এক্স

পোর্ট—'

ভদ্রলোক আর কথা না বাড়িয়ে খেতে লাগলেন। এরপর আন্দামান নিয়েও খানিকটা আলোচনা হলো। সূর্য সোম আন্দামানের খুব প্রশংসা করে বললেন, 'সবুজ পাহাড় আর নীল সমুদ্রে ঘেরা এমন প্রাকৃতিক দৃশ্য আর কোথাও দেখতে পাবেন না। যদি পারেন জাহাজে করে আশেপাশের বড় দ্বীপগুলি ঘুরে দেখতে ভুলবেন না।'

খাওয়ার পর ঘরে ফিরে চুরুট ধরালেন সৃজনকাকা। আমি ফিসফিস স্বরে বললাম, কাকা তুমি আর একটু হলেই গুবলেট করেছিলে আর কি! কিন্তু খামোখা মিথ্যে বলাটা কি ঠিক হলো?'

'ঠিকই বলেছিস। মনে হয় ভদ্রলোক খুব একটা সন্দেহ জনক নয়, খুবই ভদ্র অমায়িক। হয়তো এর দিক থেকে কোন ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তবু কাউকেই পুরো-পুরি বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।'

এবার আমাদের জিনিসপত্র গোছাবার পালা। পোর্ট ব্লেয়ারকে কেন্দ্র করে আমাদের সমস্ত জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে হবে। আপাতত এটাই হবে আমাদের হেড কোয়ার্টার্স।

স্যুটকেশ ও বেডিং খুলে সব জিনিসগুলো গুছিয়ে ফেললাম। ক্যামেরা, বাইনোকুলার, দড়ি, ফিতে, হাতুড়ি। জলের বোতল, হ্যাভারস্যাক—এগুলি সাজসরঞ্জাম হিসেবে কাজে লাগবে। তাছাড়া রয়েছে এরিয়াল ফটোগ্রাফ, স্টিরিয়োস্কোপ, নোটবই পেনসিল, লেনস ইত্যাদি।

এসব জিনিসগুলো দু'ভাগে ভাগ করে দু'টো আলাদা হ্যাভারস্যাকে পুরে ফেললাম। একটা কাকা, আর একটা আমার জন্য। কিন্তু ম্যাপগুলো গুণতে গিয়ে আঁতকে উঠলেন সৃজন কাকা, 'সর্বনাশ হয়েছে রে বাদল, বেশ কয়েকটা এরিয়াল ফটোগ্রাফ তো পাচ্ছি না।'

'কিন্তু কোথায় যাবে? সারাক্ষণই তো সাবধানে আগলে রেখেছ সব কিছু। দেখ, ভালো করে খুঁজে দেখ।'

কিন্তু অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না। দেখা গেল, দক্ষিণ আন্দামানের পশ্চিম দিকে যে দ্বীপগুলি, সেই ফটোগ্রাফগুলোই পাওয়া যাচ্ছে না। এখন উপায়! খুব দামী গোপন ডকুমেন্ট, এগুলো হারালে সর্বনাশ।

আমি বললাম, 'আচ্ছা কাকা, এগুলো জাহাজে চুরি যায় নি তো!'

আমার আবছা আবছা মনে পড়ল, সেদিন সাইক্লোনের সময় আমরা দুজনেই বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তার পরে মাঝরাতে কী রকম খুটখাট শব্দে আমার ঘুম একবার ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু মনের ভুল ভেবে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাহলে চোর কি মিঃ তলাপাত্র নাকি আর কেউ? অথবা ডঃ শ্রীবাস্তব? নাকি মঙ্গোলীয় চেহারার সেই ভীষণদর্শন লোকটা! কিন্তু এদের মধ্যে মিঃ তলাপাত্রের ব্যবহারই সবচেয়ে সন্দেহজনক।

চুরুটের ছাই ঝেড়ে কাকা গম্ভীরভাবে বললেন, 'হতে পারে—'

বিকেলের দিকে কাকার বন্ধু শংকরকাকা এলেন। শক্ত সমর্থ চেহারা, দারুণ প্রাণবন্ত মানুষ। কলেজে সৃজনকাকার সহপাঠী ছিলেন। উনিও জিয়োলজিতে এম. এস-সি, কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চাকরি নিয়ে এখানে আছেন। সাউথ আন্দামানের ডি এফ ও।

ভুরু কুঁচকে সৃজনকাকা বললেন, 'শংকর, ভারী সমস্যায় পড়ে গেছি। ভেবেছিলাম, এখানে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের প্রাথমিক কাজটা চালাব, সঙ্গে অনেকগুলি ম্যাপও নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, খানকতক দরকারী ম্যাপ মানে এরিয়াল ফাটোগ্রাফ চুরি হয়ে গেছে।'

ম্যাপ চুরি! অবাক কাণ্ড। এতদিন আন্দামানে আছি। কিন্তু কোনদিন তো ম্যাপ চুরির কথা শুনিনি। তোর ম্যাপ নিয়ে এখানে কার কী হবে বল তো!' শংকরকাকা ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

'না না, সত্যি!' এবারকার ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আন্দামান সম্পর্কে এখন বাইরের অনেকেই ইন্টারেস্টেড। সুতরাং—' কাকা শংকরকাকাকে ঘটনার যুক্তিগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শংকরকাকা এবারও সবকিছু হেসেই উড়িয়ে দিল।

'শোন সৃজন, ওসব আজেবাজে চিন্তা ছাড়। আন্দামানে এই প্রথম এসেছিস। চল, এখানকার সব জায়গাগুলো ঘুরে দেখবি।'

সৃজন কাকা কী আর করবেন, আপাতত ম্যাপ চুরির ব্যাপারটা চেপে গেলেন। শংকরকাকাই গাড়ির বন্দোবস্ত করলেন। সেই গাড়িতে চড়ে আমরা সমস্ত দক্ষিণ আন্দা-মান চষে ফেললাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন শংকরকাকার স্ত্রী সুরমাকাকীমা আর ওঁদের দশ বছরের মেয়ে রুপাই। মেয়ে হলে কী হবে অসম্ভব দুষ্টু আর দারুণ বুদ্ধি মাথায়। ওকে দেখে পাপিয়ার কথা মনে পড়ল। মনে হলো কতদিন ওদের দেখি না। সুরমাকাকীমা কলকাতার মেয়ে, খুব সৌখিন তবে ভালো ভালো রান্না করতেও ওস্তাদ। কাকীমা আর রুপাই দুজনকেই খুব ভালো লাগল আমার।

পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেল, যেখানে স্বদেশী আমলের বাঘা বাঘা বিপ্লবীদের আটকে রাখত, করবাইনস কোভের সমুদ্রসৈকত, পোর্ট ব্লেয়ারের চৌরঙ্গী - অ্যাবারডিন বাজার, দক্ষিণ আন্দামানের দক্ষিণ প্রান্তসীমা চিড়িয়া টাপু, উত্তরের পাহাড়ে ঘেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উইম্বার্লিগঞ্জ, ব্যামবু ফ্ল্যাট — কিছুই বাকি থাকে নি। আন্দামানে এসে সবচেয়ে প্রথমে

আমার যা চোখে পড়েছে, তা' হলো সতেজ সবুজ নিবিড় অরণ্য। এমন গাঢ় সবুজ আমি এর আগে আর কোথাও দেখি নি। যেদিকে তাকাও সবুজ ঘন অরণ্য নতুবা ফিরোজা নীল সমুদ্র। আন্দামানের প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করল, হয়ে উঠল আমার ঘুমের স্বপ্ন।

চিড়িয়া টাপুর সুন্দর বাংলোতে আমরা দুপুরের খাওয়া সারলাম। চিড়িয়া টাপুর দক্ষিণদিকে আর একটা দ্বীপ। সেটার দিকে হাত দেখিয়ে শংকরকাকা বললেন, ওটা রাটল্যাণ্ড দ্বীপ। মোটামুটি বড়ই তবে লোকজন নেই।'

রাটল্যাণ্ড নামটা শুনে লাফিয়ে উঠলেন কাকা, আরে তবে তো আমাদের এখান দিয়েই যেতে হবে।

পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে কীসব দেখতে লাগালেন কাকা।

শংকর কাকা ইয়ার্কির ঢঙে ধমক দিলেন, 'বন্ধ করতো তোদের ম্যাপ। এসব তো আছেই। আজকের দিনটা অন্তত আনন্দ কর।'

উইম্বালিগঞ্জ হয়ে শংকরকাকার বাড়িতে ফিরে এলাম সন্ধেবেলা। ওখানে রাতের নেমন্তন্ন ছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে গেস্ট হাউসে ফিরতে ফিরতে প্রায় মাঝ রাত।

পৌঁছে দেখি, বাংলোর বারান্দায় বেশ কয়েকটা ষণ্ডা চেহারার লোক বসে আছে। এমন সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিঃ সোম। হাতে একরাশ নোটের তাড়া। মিঃ সোমকে এভাবে দেখে আমরা একটু থমকে দাঁড়ালাম। দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম উনি কী করেন। দেখলাম মিঃ সোমের হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে লোকগুলো চলে গেল। এবার হঠাৎ আমাদের সামনে দেখে খানিকটা চমকে গেলেন মিঃ সোম।

'কী ব্যাপার! এত রাতে আপনারা?' মিঃ সোমের গলার স্বর গম্ভীর। সৃজন কাকা শান্তগলায় উত্তর দিল, 'এই একটু বেরিয়ে ফিরলাম।

'তাই নাকি!' মিঃ সোমের গলায় ব্যঙ্গ বিরক্তি ও ক্রোধ। বদখদ গুণ্ডা চেহারার এই লোকগুলোকে দেখে খুবই খটকা লাগল। বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না, সূর্য সোমকে যতটা সহজ মনে করেছিলাম উনি মোটেই তা' নয়।

পরের দিন পুরোপুরি বিশ্রাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বাইরের বারান্দায় বসে গল্প করছি। মিঃ সোম কোথায় বেরিয়ে গেছেন। ওর ঘরে তালা লাগানো। সৃজনকাকা বললেন, 'আমার মনে হয় পাখি কেটে পড়েছে। কালকের ঘটনার পর তোর কি মনে হয় না মিঃ সোম লোকটা খুবই ঘড়েল। তুই কি বলিস বাদল?

আমি সৃজনকাকার সঙ্গে এক মত। অথচ দিন দুয়েক আগেও আমাদের ধারণা ছিল, ভদ্রলোক খুবই ভালো।

চৌকিদার খবরের কাগজ দিয়ে গেল। প্লেনে করে কলকাতা থেকে তিনদিন পরে আজই খবরের কাগজ এলো।

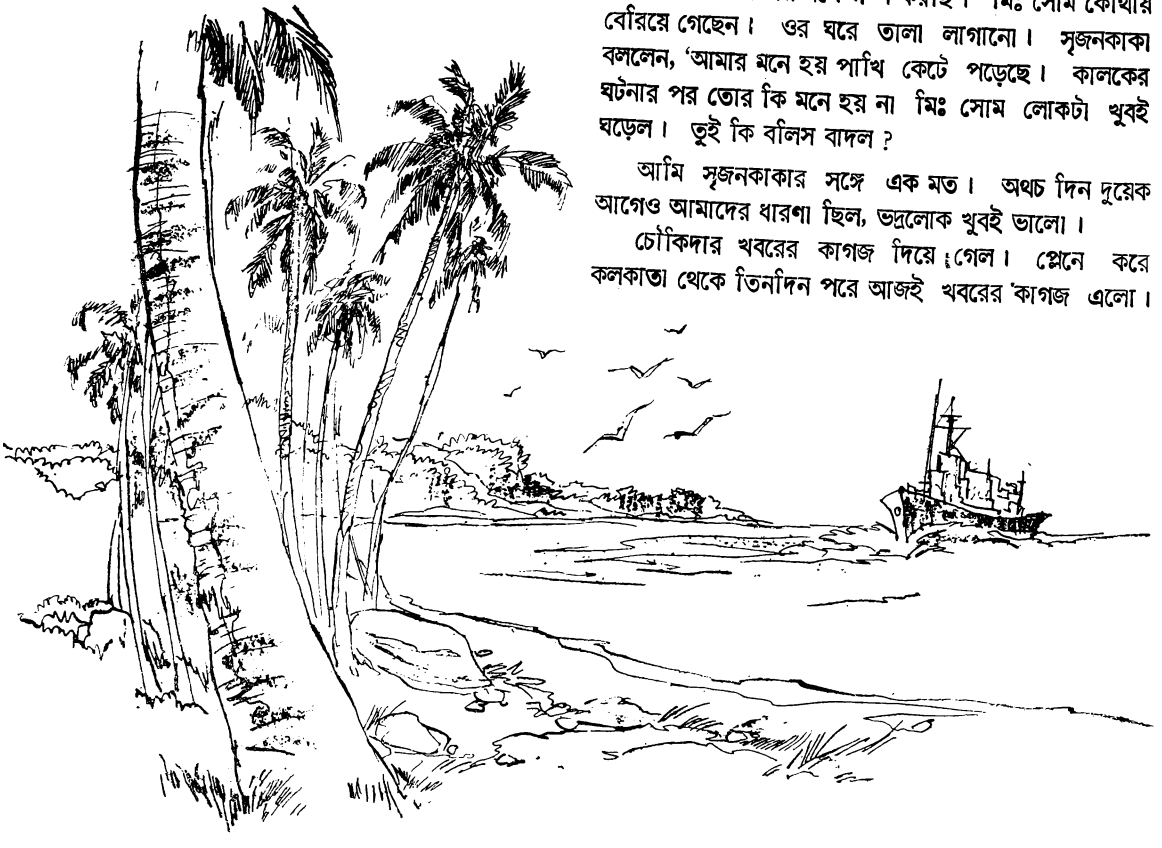

আন্দামানে দেখছি, কলকাতার মতো রোজ খবরের কাগজ পাওয়া যায় না। শুধু সোমবার আর বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে প্লেনে করে খবরের কাগজ আসে।

খবরের কাগজগুলো বগলদাবা করে কাকা ঘরের দিকে এগোলেন, 'চল বাদল, ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে বরং কাগজ পড়া যাক।'

কলকাতায় থাকতে রোজ খবরের কাগজ অন্ততপক্ষে খেলার পাতাটা একবার অন্তত আমার পড়া চাই। তাই এখানে খবরের কাগজ না পেয়ে এ'কদিনেই বেশ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে বেশ মৌজ করে খবরের কাগজের খেলার পাতাটা দেখছি। পাশের খাটে কাকা কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দেখেছিস বাদল, একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন।'

কাকার কথা শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম। রবিবারের কাগজের দু'নম্বর পাতায় একটা বিজ্ঞাপন দেখালেন কাকা। বিজ্ঞাপনটা সাইজে ছোট, সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু বিজ্ঞাপনের ভাষা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজি থেকে বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

"পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে এমন এক ব্যক্তি অবিলম্বে প্রয়োজন। প্রার্থীকে অবশ্যই বয়সে তরুণ, অত্যন্ত সাহসী এবং ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কর্মস্থল পৃথিবীর যে কোন স্থানে, বিশেষত বঙ্গোপসাগরের যে কোন দ্বীপে হইবার সম্ভাবনা। উপযুক্ত প্রার্থীকে যথেষ্ট মাহিনা দিতে প্রস্তুত অবিলম্বে দরখাস্ত করুন। **পোস্ট বক্স 888 সিঙ্গাপুর।**'

বিজ্ঞাপনটা একবার নয়, দু'বার নয়, বেশ কয়েকবার পড়লাম। পড়ে খানিকটা অবাক হলেও বিজ্ঞাপনের কোন তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না। কাকাকে বললাম, 'তুমি কি চাকরির জন্য এখানে দরখাস্ত করবে নাকি!'

'আরে না না। এখানে আমার চাকরি করবার কোন কথাই ওঠে না। কিন্তু বিজ্ঞাপনটা খুবই আশ্চর্য ধরনের, তাই না! প্রথমত, সিঙ্গাপুরের চাকরির জন্য কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনের সাইজ এত ছোট কেন! তৃতীয়ত পুরো ঠিকানা না দিয়ে সিঙ্গাপুরের পোস্ট বক্সের ঠিকানা। চতুর্থ কর্মস্থল হবে বঙ্গোপসাগরের কোন দ্বীপ অর্থাৎ নির্ঘাত আন্দামান।'

'কেন, আন্দামান না হয়ে ইন্দোনেশিয়া কিংবা বার্মার কোন দ্বীপেও তো হতে পারে—'

'হতে পারে, কিন্তু আন্দামানে হবার সম্ভাবনা বেশি। না হলে কলকাতার পত্রিকায় হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেবে কেন?'

এত কথার পরে সমস্ত ব্যাপারটার রহস্য আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না, তাই চুপ করেই রইলাম। সৃজনকাকা বলে গেলেন, 'এ রকম যে একটা ব্যাপার থাকতে পারে বা ঘটতে পারে, তা' কিন্তু আমি আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। পৃথিবীময় পেট্রোলিয়ামের দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর থেকেই তেলচোরদের দৃষ্টি এই দ্বীপের ওপর পড়েছে। বুঝলি বাদল, আমাদের এবার থেকে আরো সাবধান হতে হবে। বলা যায় না, আমরা হয়তো আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীদের খপ্পরে পড়ে যেতে পারি।'

আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীদের কথা শুনে হঠাৎ নিজেকে বেশ নারভাস লাগল। ওদের কথা এতদিন শুধু ডিটেকটিভ বইতেই পড়ে এসেছি। কিন্তু এবার ওদের সঙ্গে চাক্ষুষ মোলাকাৎ হবে—ব্যাপারটা ভাবতেই খুব রোমাঞ্চিত হয়ে পড়লাম।

সৃজনকাকা বললেন, 'আমাদের এদিককার কাজকর্ম খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে এবং যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব। শংকরের মারফৎ ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের একটা জাহাজও পাওয়া গেছে—'

ভুরু কুঁচকে বললাম, কিন্তু আমাদের কাজকর্মটা ঠিক কী তাতো বলছ না!'

কাকার গলা খানিকটা গম্ভীর, 'তুই এখন ছোট, সবকিছু বুঝবি না, বোঝার দরকারও নেই। তবে বেরোবার আগে একবার ডঃ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

ডঃ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো না। শুনলাম উনি নাকি দু'তিনদিনের মধ্যে মিডল আন্দামানে চলে যাচ্ছেন।

সন্ধের দিকে আমাদের গেস্ট হাউসে এলেন শংকর-কাকা। দু'বন্ধুতে মিলে নিচু গলায় ফিসফিস করে খুঁটিনাটি অনেক আলোচনা হলো, তার সবকিছু বুঝলাম না। তবে বুঝতে পারলাম, এই আলোচনা আমাদের আসন্ন অভিযানকে ঘিরেই। আরো বুঝলাম, আমাদের অভিযান প্রথমে যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হবে। অনেক বদমায়েশ চক্র, অনেক জটিল চক্রান্ত নাকি জড়িয়ে গেছে এর সঙ্গে। আসন্ন রহস্যের ছোঁয়ায় শরীরের রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

কাকা বললেন, 'শোন বাদল, আগামী বুধবার অর্থাৎ পরশু সকালে আমরা রওনা হচ্ছি জাহাজে চেপে। খানিকটা বিপদের ঝুঁকি আছে কিন্তু। আমাদের সঙ্গে যাবি—নাকি রুপাইদের ওখানে থাকবি?'

ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব, তেমন ছেলে আমি নই। বুক চিতিয়ে জবাব দিলাম 'নিশ্চয়ই যাব।' [চলবে]

আজব প্রাণী ক্যামেলিয়ন্

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

সারা পৃথিবীতে টিকটিকি-গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। তাদের মধ্যে 'ক্যামেলিয়ন্' (chameleon) নামে এক ধরনের প্রাণী নিয়ে আলোচনা করব। যাদের প্রজাতির সংখ্যা 40টি। এদের আমরা প্রায়ই বাড়ির আনাচ-কানাচে বা আগান-বাগানে দেখতে পাই। এদের আমরা বাংলায় বলি 'বহুরূপী'। এদের বহুরূপী বলার কারণ হল এরা পরিবেশের সঙ্গে নিজের গায়ের রঙের পরিবর্তন করতে পারে। তাছাড়া এরা জিভের সাহায্যে যেভাবে শিকার ধরে, তা আমাদের অবাক করে। এদের 80টি (eighty) প্রজাতির যাদের বেশির ভাগ দেখা যায় আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারে। এছাড়া ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, আরব, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে এদের সন্ধান মেলে। ক্যামেলিয়ন'দের দৈর্ঘ্য 2 ইঞ্চি থেকে শুরু করে প্রায় 2ft পর্যন্ত হয়। আফ্রিকা ও ম্যালাগ্যাসিতে তিন শিংওয়ালা এক ধরনের ক্যামেলিয়নও দেখতে পাওয়া যায়।

এদের শরীরের মাঝখানটা বেশ মোটা। পিঠে ছোট ছোট কাঁটা থাকে। এদের পাগুলো এমনভাবে অভিযোজিত যে এরা অনায়াসে গাছের মসৃণ গা বেয়ে তর্‌তর্‌ করে যেতে পারে। আবার অনেক সময় কোন কিছু ঝুলে আঁকড়ে থাকতে পারে। কারণ এদের হাত-পায়ের প্রতিটি আঙুলের মাথায় কতকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থি থাকে। চলার সময় অল্প চাপ দিলে এইসব গ্রন্থি থেকে আঠালো একপ্রকার রস বের হয়ে আসে, যা ক্যামেলিয়নের গাছের মসৃণ গা বেয়ে চলাফেরা করতে সুবিধা হয়।

এদের শিকার ধরাটাও বেশ সুন্দর। এরা সাধরণতঃ কীটপতঙ্গ ধরে খায়। তবে আফ্রিকা ও ম্যালাগ্যাসির তিন-শিংওয়ালা ক্যামেলিয়ন পাখি ধরেও খায়। তাদের এই শিকার ধরার জন্য জিভটাই প্রধান। তাই এদের জিভে কিছু অভিযোজন (Adaptation) ঘটেছে। এদের জিভটা এদের শরীরের মত লম্বা অথবা শরীরের থেকেও বড় হয়। এই লম্বা জিভটা ফাঁপা এবং তা মুখের ভেতর গোটানো থাকে। প্রয়োজনে অর্থাৎ শিকারের সময় লম্বা জিভটাকে বার করে। তাছাড়া জিভের ডগায় একটা গোলাকৃতি মাংসপিণ্ড থাকে এবং কতকগুলি বিশেষ-ধরনের গ্রন্থি এদের জিভে থাকে, যা থেকে একধরনের আঠাল রস বের হয়ে জিভটাকে চটচটে রাখে। যখন কোন কীট-পতঙ্গ দেখতে পায় তার দিকে ক্যামেলিয়ন বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে তাকে চটচটে জিভের সাহায্যে আটকে ফেলে মুখের ভেতর টেনে আনে। তাদের এই শিকার করাটা এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে ঘটে, ফলে আমরা যারা তার এই শিকার ধরাটা লক্ষ্য করি, সবসময় আমাদের চোখে পড়ে না। এইভাবে শিকার ধরার জন্য তার চোখ কিন্তু বিশেষভাবে সাহায্য করে। গবেষকরা বলেন এরা দুটো চোখ দিয়ে দু'দিকে ভিন্ন জিনিস দেখতে পায়, সেজন্য এদের মাথা ঘোরানোর আর বিশেষ প্রয়োজন হয় না। আসলে এদের একটা চোখ শিকারের সন্ধান করে এবং অন্য চোখটা কাছাকাছি কোন শত্রু আছে কিনা দেখতে সাহায্য করে।

ক্যামেলিয়নের আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হল এরা প্রয়োজনে গায়ের রঙ বদল করে। এরা ভয় পেলে, আলোর তীব্রতা, ঠাণ্ডা-গরম প্রভৃতির জন্য এবং চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য দেহের রঙের ইচ্ছেমত পরিবর্তন করে। রং পরিবর্তনের এই ঘটনাকে ক্যামোফ্লেজ (Camouflage) বলা হয়। যেমন যখন কোন গাছে থাকে, তখন গায়ের রং সবুজ পাতার মত করে, যখন মাটির ওপর দিয়ে চলাফেরা করে তখন গায়ের রং বাদামী করে। যখন সমস্ত রঞ্জক পদার্থগুলি চামড়ার উপরে আসে তখন এদের রঙ বাদামী হয়। আর প্রথম স্তরের হলুদ ও তৃতীয় স্তরের নীল মিলে সৃষ্টি করে সবুজ। আর যখন কোনস্তর ওঠানামা করে না, তখন গায়ের রং হয় হলুদ অথবা লাল।

ক্যামেলিয়নদের বেশির ভাগ প্রজাতি ডিম পাড়ে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু প্রজাতি সরাসরি বাচ্ছা প্রসব করে। বাচ্ছা প্রসব করে তাদের দিকে দৃষ্টি তো দেয় না, যদি খুব ক্ষুধার্ত হয় তাহলে বাচ্ছা-কেও খেয়ে ফেলে।

ছবি—সুজিত মুখোপাধ্যায়

জয়রামপুর, শুকদেবপুর, 24 পরগনা 743503

খেলার টুকিটাকি

অজয় দাশগুপ্ত

ওয়াল্ট ডিজনের নাম পৃথিবী বিখ্যাত। সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি কার্টুন ছবি উপহার দিয়েছিলেন। ডিজনে সাহেবের এই কার্টুন চরিত্রের একটি চরিত্রের নাম মিকি-মাউস। পর্দায় মিকি মাউসের কাণ্ডকারখানা দেখে ছেলে-বুড়ো সবাই হেসে খুন হন। কিন্তু কোনো খেলোয়াড়ের নাম মিকি মাউস হয়েছে এটা বোধহয় আজ অনেকেই ভুলে গেছে। খেলোয়াড়টির পারদর্শিতা দেখে দর্শকরা তাঁকে ভালবেসে এই নাম দিয়েছিল। এই খেলোয়াড়টি হলেন পরাধীন ভারতের একজন ফুটবলার—যাঁর নাম ছোনে মজুমদার।

ভারত স্বাধীন হবার বেশ কিছুদিন আগে একটি ভারতীয় ফুটবল দল অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল। সেই দলে ছোনে মজুমদার ছিলেন। তিনি ছিলেন ফুটবলে ডজিং এর যাদুকর। অবিশ্বাস্যভাবে অবলীলায় দুতিন প্রতি পক্ষকে ডজ করে ঠিক মিকি মাউসের ভঙ্গিতে বল নিয়ে এগিয়ে যেতেন। অস্ট্রেলিয়াবাসী তাঁর এই অদ্ভুত ডজিং দেখে তাকে 'মিকি মাউস' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বাংলার ডেনিস কম্পটন বলা হত বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ নির্মল চ্যাটার্জিকে। ডেনিস কম্পটন ইংলাণ্ডের হয়ে বিশ্ব দলে ফুটবল ও ক্রিকেট দুটি বিষয়েই প্রতিনিধিত্ব করেন। ইংল্যাণ্ড ফুটবল দলে তিনি রাইট ইন পজিশনে খেলতেন। আবার ক্রিকেট খেলায় তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের একজন অপরিহার্য ব্যাটসম্যান। টেস্ট ক্রিকেটে যাঁর পাঁচ হাজারের ওপর রান ও 15টি শতরান আছে। এই কম্পটন একবার ক্রিকেট খেলায় পা দিয়ে শট করে ভারতীয় ব্যাটসম্যান মার্চেণ্টকে রান আউট করেছিলেন। ফুটবলে দক্ষতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

নির্মল চ্যাটার্জি ছিলেন বাংলার বিখ্যাত ক্লাব মোহন-বাগান দলের রাইট উইং। চল্লিশের দশকে যাঁরা ফুটবল মাঠে যেতেন তাঁরা এই অসাধারণ ড্রিবলারকে দেখেছেন। নির্মল চ্যাটার্জি বল পেলে অনায়াসে দুতিনজনকে কাটিয়ে গোলমুখে সেণ্টার করতেন।

অসাধারণ এই ফুটবলারই আবার যখন ক্রিকেট খেলতেন তখন অন্য মূর্তি। হাতে ছিল মারের ফুলঝুরি। তিনি কপি বুক খেলার ধার ধারতেন না। নতুন নতুন শট উদ্ভাবন করতেন। দর্শকরা যেমন চাইত তেমন ভাবে অবহেলায় চার মারতেন। কোনো বোলারই তাঁর কাছে পাত্তা পেত না। দুই খেলাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল তুঙ্গে। ব্যাকরণের ধার ধারতেন না বলে অনেকে তাঁকে বাংলার মুস্তাকও বলত। ভারতের প্রথম অস্ট্রেলীয় সফরে তিনি দলে সুযোগ পান; কিন্তু তখন ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডে বাঙালির আধিপত্য ছিল না। তাই মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

টেবিল-টেনিস বা পিংপং খেলায় পঞ্চাশের দশকের পর থেকে প্রাচ্যের আধিপত্য ক্রমবর্ধমান। প্রথমে জাপান তারপর চীন এই খেলায় প্রচণ্ড উন্নতি করে। এর আগে টেবিল টেনিসে ইউরোপীয় দেশগুলিরই প্রাধান্য ছিল আজকের অনেকে হয়তো জানেই না। এক সময় একজন খেলোয়াড়ের কাঁধে ভর রেখে অস্ট্রিয়া কতবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। টেবিল-টেনিসের সেই প্রবাদ পুরুষের নাম ভিক্টর বার্না। তিনি তাঁর সময়ে যে কোনো প্রতিপক্ষকে হেলায় হারিয়ে-ছেন। পর পর বহুবার বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন। ফুটবলে যেমন পেলে হকিতে ধ্যানচাঁদ, ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যান টেনিসে বিয়ন বর্গ, ব্যাডমিণ্টনে বুডি হরেতানো অ্যাথলেটে জেসি ওয়েন্স তেমনি ছিলেন ভিক্টর বার্না।

গত সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর : ফুটবলে সমস্ত কিছু শেখানোর পর কোচেরা খেলোয়াড়দের উদ্দীপ্ত করার জন্য মুখে যে ভাষণ দেন তাকেই ভোকাল টনিক বলে। ময়দানে বিখ্যাত কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি এ ব্যাপারে সবচেয়ে সফল। তাঁকে কেন্দ্র করেই এই শব্দটি চালু হয়।

এবারেও একটা প্রশ্ন রাখা গেল : রাউণ্ড দি উইকেট ও ওভার দি উইকেট বোলিং-এর পার্থক্য কি ?

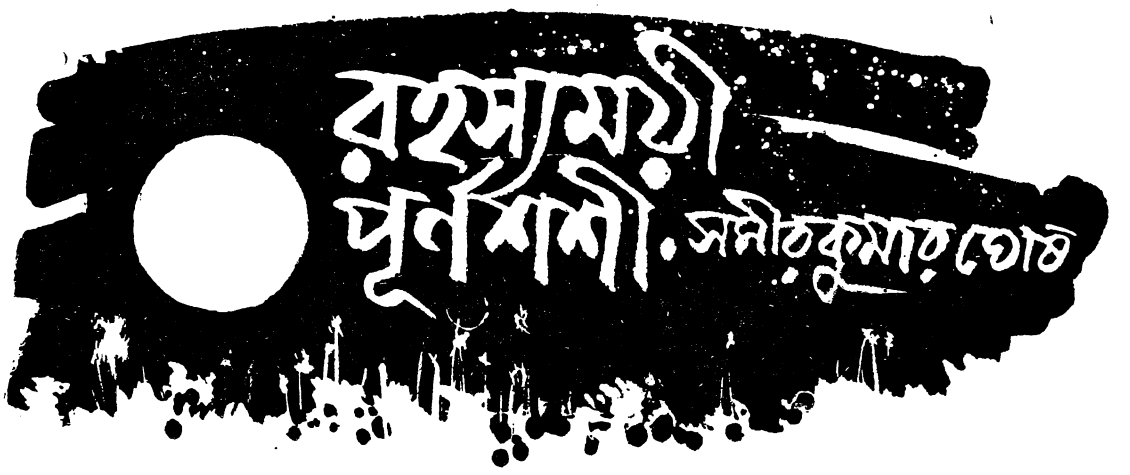

পূর্ণিমার রাতে আকাশের ঐ মোহময়ী চাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে কেমন হয়? লাস্যময়ী ঐ পূর্ণশশী যতই সৌন্দর্যের অধিকারিণী হোক্ না কেন, মানুষের চোখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে, এর জুড়ি মেলা ভার। কারণ, রাত যতই গভীর হ'তে থাকে, পূর্ণিমার চাঁদ ততই মধ্য-আকাশের দিকে যেতে থাকে এবং আমাদের চোখে ক্রমশই আকারে ক্ষীণ হয়ে প্রতিভাত হতে থাকে। পূর্ণিমার রাতে দিগন্ত সন্ধ্যায় উদীয়মানা চাঁদ যতখানি বিশাল আকারের বলে মনে হয়, মধ্যরাতে শীর্ষ আকাশে তাকে কিন্তু আকারে অনেক ছোট বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আকার কি সত্যি সত্যি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে থাকে? নাকি, রহস্যময়ী চাঁদের এ এক বিভ্রান্তি? ঘটনাটি কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সত্য বলেই মনে হয় বলে, বহুকালযাবৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী ঘটনার মূল উৎস খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছেন।

মধ্যআকাশে অবস্থানকালে, চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে এসে যায়। ফলে, দিগন্তে অবস্থানকালীন আকারের চেয়ে একে তখন অনেক বড় দেখানো উচিত। কিন্তু ঘটনাটি ঘটে ঠিক উল্টো। ঘটনাটির প্রাথমিক ব্যাখ্যা হিসাবে হয়ত ভাবা যেতে পারে যে, যেহেতু দিগন্তে থাকাকালীন চাঁদকে আমরা বাড়িঘর, গাছপালা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দেখি, সেজন্য তাকে আপেক্ষিকভাবে বড় দেখায়। কিন্তু মাথার উপরে চাঁদকে শূন্যে একা দেখি বলে, তাকে অনেক ছোট দেখায়। অনেকে আবার বলেন যে, বেশি ধূলাবালি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, দিগন্তের চাঁদকে আমরা দেখি বলে, তাকে আকারে বড় দেখায়। যাই হোক, এই রহস্যের আসল সূত্র উদ্ঘাটনের জন্য 1925 সালে বার্লিনের এক মহিলা বিজ্ঞানী, শ্রীমতী এরনা শ্যার একটি ঘরের মধ্যে আয়নার সাহায্যে, পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব একই সাথে, মাথার উপরে ও দেওয়ালে ঠিক একই দূরত্বে নিক্ষেপ করে দেখেন যে, দেওয়ালের প্রতিবিম্বের আকার অনেক বড় বলে মনে হচ্ছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধূলাবালি ইত্যাদির উপস্থিতি, এই ঘটনার জন্য মোটেই দায়ী নয়। তাঁর মতে, চাঁদের আকারের এই আপাত হেরফেরের মূল কারণ কিন্তু আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের অধ্যাপক বোরিং-এর এক বিশেষ পরীক্ষানুযায়ীও এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই দৃষ্টিবিভ্রমের অপসারণ এভাবেও করা যায়। যদি একটি সরু চোঙার মধ্য দিয়ে বা হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে তৈরি একটি বৃত্তাকার গর্তের মধ্য দিয়ে, দিগন্তের চাঁদের দিকে তাকানো যায়, তাহলে তার আকার তখন অনেকটা হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হবে। অপরদিকে, যদি মাটিতে চিৎ হ'য়ে শুয়ে, মধ্য আকাশের দিকে তাকানো যায়, তাহলে তখন তার আকার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হবে। এ সমস্তই তাহলে দৃষ্টিবিভ্রমের পরিণতি। শিশুদের ক্ষেত্রে এই বিভ্রমের অনেক মাত্রাধিক্য ঘটে। আবার এক চোখ বন্ধ করে, এই পরীক্ষা চালালে দেখা যায় যে, বিভ্রান্তির পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল যে, এই দৃষ্টিবিভ্রমের মূল রহস্যটা কোথায়? বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের পারিপার্শ্বিক চিরপরিচিত বস্তুগুলি আমাদের চোখে একটা নির্দিষ্ট আকারের বলে সবসময়েই মনে হয়। যেমন একটি মোটর-গাড়ি আমাদের কাছে একটি মোটরগাড়ির নির্দিষ্ট আকারের বলেই মনে হবে। তা সেই গাড়িটি আমাদের চোখ থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন। দূরত্ব অনুযায়ী, আকারের ঐ

হেরফেরের জন্য অজ্ঞাতসারে আমরা আমাদের চোখের ভেতর প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজটা করে নিতে সক্ষম হই। দিগন্তের চাঁদকে গাছপালার নেপথ্যে আমরা যখন দেখি, তখন তাকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত বলে মনে করি। অথচ মধ্যআকাশের চাঁদকে আমরা বিনা বাধায় বস্তুবিহীন আকাশে দেখি বলে, তাকে তখন অপেক্ষাকৃত ছোট আকারেব বলে, আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে কল্পনা করে নিই ; আর সমস্ত ঘটনাটিই ঘটে আমাদের অজ্ঞাতসারে ; মানসিক এক অনুভূতির তারতম্যের ফলে। দিগন্তের চাঁদ অপেক্ষাকৃত দূরে থাকে আর মধ্য আকাশের চাঁদ অপেক্ষাকৃত কাছে থাকে বলেই, আমাদের চোখের এক অজ্ঞাত অনুভূতির দ্বারাই, আমরা চাঁদের এই দুই অবস্থানে, তার আকারের হেরফের ঘটিয়ে ফেলি। সুতরাং রহস্যজনক এই ঘটনাটির মূল কারণ যতটা মানসিক ও মনোবৈজ্ঞানিক, ততটা বাস্তবিক নয়। তবুও ঘটনাটা আমরা ঘটতে বাস্তবে সত্যই দেখি।

যে কোন এক পূর্ণিমারাতে, চাঁদের এই দুই অবস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখলেই, রহস্যের আসল সূত্রটি অনায়াসেই ধরে ফেলা যাবে।

গ্রামীণ উন্নয়নে বিজ্ঞান কর্মশালা ও প্রদর্শনী

ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর অধীনে গত 18-24 মার্চ 1988 সাউটীয়া মিলনী সংঘের পরিচালনায় বিজ্ঞান কর্মশালা ও প্রদর্শনী মেদিনীপুর জেলার সাউটীয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কানাই ভৌমিক কর্মশালা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রায় 25জন বিজ্ঞানসেবীর সহায়তায় 53 জন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী কর্মশালায় যোগ দিয়ে বিজ্ঞানের প্রায় 15টি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা নেয় ও আলোচনা করে। টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর নানাবিধ মডেল ছাত্রদের প্রভূত আগ্রহের সঞ্চার করে। কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, আই, আই, টি খড়্গপুর, হলদিয়া বিজ্ঞান পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগগুলি এই অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন। বিড়লা মিউজিয়াম, সায়েন্স মিউজিয়াম VSIS, ভারত সরকারের mass media, পশ্চিমবঙ্গসরকারের তথ্যদপ্তর। আই আই টি খড়্গপুরের Post harvesting Technology centre বিজ্ঞান বিষয়ের ফিল্ম, ক্যাসেট, নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে এই কর্মশালা ও প্রদর্শনী সফল করে তোলেন।

প্রতিদিন প্রায় 500 ছাত্রছাত্রী ও 2000 মানুষ প্রদর্শনী দেখতে আসেন। গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই অভূতপূর্ব সাড়া থেকে মনে হয় সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত।

সংসদের অভিধান গ্রন্থমালা

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও ধীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত সংশোধিত

- **Samsad English Bengali Dictionary 47·50**
- **Samsad Bengali English Dictionary 47.50**
- **Samsad Student's Eng. Beng. Dictionary 24.00**

শ্রীঅঞ্জলি বসু সঙ্কলিত :

- **Samsad Commonwords Dictionary 14·00**

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিভ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংশোধিত

- **সংসদ বাঙ্গালা অভিধান ৪২·৫0**

শ্রীঅঞ্জলি বসু সঙ্কলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত

- **সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান** (যন্ত্রস্থ)

শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

সংসদ সমার্থশব্দকোষ (যন্ত্রস্থ)

শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ ও ডঃ শিবানী রায় সঙ্কলিত ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত সংশোধিত

- **Samsad Student's Beng. Eng. Dictionary 20.00**

(বিশদ তালিকার জন্য লিখুন)

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা-৯

ফোন ৩৫-৭৬৬৯ / ৩৫-৩১৯৫

মার্ক টোয়েনের 'এ কানেকটিকাট ইয়াংকি ইন কিংআর্থারস কোর্ট' অনুসরণে

যুগের ভিতর যুগ

চিত্রনাট্য
অনিল কর্মকার
ছবি
গৌতম কর্মকার

বেলা বারোটা। শিঙ্গার গর্জনে পৃথিবী কেঁপে উঠলো। সামনে মশাল হাতে ঘাতক দাঁড়িয়ে। রাজাআদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চার পাশ ঘিরে আগুন জ্বলে উঠবে।

কিন্তু তার আগেই বিহ্বল জনতা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো- সূর্য নিভে যাচ্ছে! হাই-যু-মাকসমাক নিভিয়ে দিচ্ছেন আমাদের সূর্যকে।

আনন্দে হুংকার দিয়ে উঠলাম আমি- হ্যাঁ সূর্যকে আমি একেবারে নিভিয়ে দেবো। এ পৃথিবী আর কখনও তার মুখ দেখবে না। বরফ গলবে না, শস্য ফলবে না। অসহ্য শীতে তোমরা তিল তিল করে ঢলে পড়বে মৃত্যুর কবলে।

ওয়ারউইক দুর্গ। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। অত্যাশ্চর্য সেই মানুষটির সঙ্গে তখনই আলাপ।
গুড মর্নিং স্যার। কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে। তবে এখানে নয়।
বেশ তো, চলুন। একটু নিরিবিলি দেখে বসা যাক।
দিনটা আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে। ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীর কত ভুলে-যাওয়া গল্পের মায়ায় সে যে কোথায় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।
স্যার বেডিভিয়ার, স্যার ল্যান্সলট - রাউন্ড টেবিলের বিখ্যাত সব নাইটের কাহিনী ও কেমন করে বলে যায়?
মানুষের আত্মা যেমন এক দেহ থেকে আর এক দেহে প্রবেশ করে, আমার জীবনে তেমনি একটা যুগ আর এক যুগের ভিতর প্রবেশ করেছিল। চলুন, দেখবেন।
এই যে বর্মটি দেখছেন, এর মালিক ছিলেন স্যার স্যাগ্রামোর - রাজা আর্থারের প্রিয় নাইট।
বুকের বাঁদিকে লোহার বর্মে এই যে ফুটোটা, এটা একটা রহস্য। বন্দুক বা পিস্তলের গুলী ছাড়া এটা হতে পারে না। কেউ কেউ মনে করেন - ক্রমওয়েলের সৈন্যদের মধ্যে কেউ হয়তো এটা করেছে। অর্থাৎ - সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা।
বিশ্বাস করবেন না। ওই গুলীটা - ওটা আমারই - আমিই করেছিলাম।
কী বলছে ও? ষষ্ঠ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে পিস্তলের ব্যবহার -- এ কে?

গভীর রাত। বিকেলবেলার পরিচিত সেই লোকটির কথা বারবার ভাবছিলাম।
উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ!
খট-খট-খট
দরজা খুলে অবাক- সেই মানুষটি!
আরে, আসুন আসুন, উষ্ণ পানীয়ে আপত্তি নেই নিশ্চয়?
না না, তা থাকবে কেন?
আমি কিন্তু এসেছি আমার ইতিহাস আপনাকে জানাতে। আর ক'দিনই বা পৃথিবীতে থাকবো! দয়া করে একটু সময় আমাকে দিন!
এ তো আনন্দের কথা, আপনি বলুন।
আমি আমেরিকার মানুষ। জন্ম হার্টফোর্ডে- কানেক্টিকাট প্রদেশে। আমার বাবা ছিলেন কর্মকার, খুড়ো ঘোড়ার ডাক্তার। আমি দু'টোই হলাম। কিন্তু ভালো লাগলো না বেশীদিন।
তাই চলে এলাম একটা অস্ত্র তৈরীর কারখানায়। বছরের পর বছর ধরে সব শিখলাম। হয়ে গেলাম উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকর্মা। কারখানার সর্বময় কর্তা। দু'হাজার লোক কাজ করে আমার অধীনে।
এক দিন···
মাপ করবেন স্যার! হারকিউলিস আপনার হুকুম মেনে কাজ করতে রাজী হচ্ছে না।
এতোদূর স্পর্ধা! চলতো, দেখছি।

কী হে, দাঁড়িয়ে কেন? আমার হুকুম মানতে না পারলে বিদেয় হও।
বিদেয়? তবেরে! দেখি- কে কাকে বিদেয় করে।
ঠকাস...
আঁক!
মনে হোল-মাথার ভিতর সব কিছু যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। তারপর--আর কিছু মনে নেই।
জ্ঞান হতে দেখলাম- একটা ওক গাছের নিচে আমি বসে আছি।
আশ্চর্য! এ কোথায় এলাম?
ও আবার কে আসছে? মনে হচ্ছে- সার্কাসের লোক।
..খট খট..
..খট.. খট..
কী মশায়, একহাত হবে?
কী..কী হবে?
ডুয়েল, মানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ধরুন কোনও সম্পত্তি কিংবা কোনও রূপসী মহিলার জন্যে।
4

[৫]

অশান্ত আকাশ রহস্য

আকাশ সবার কাছেই এক অনন্ত বিস্ময়। প্রায় শোনা যায়, আকাশ থেকে টাকা-পয়সা, ব্যাঙ, মাছ, কৃস্ট্যাল, পাথর, রক্ত, মাংস, মাকড়শার জাল, দেবীমূর্তি, মরা পাখি, সাপ, আগুন এবং আরও কত কি ঝাঁকে ঝাঁকে আছড়ে পড়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে।

আবার, বহু জিনিসও সোঁ সোঁ করে উধাও হয়ে যাচ্ছে আকাশে। যদিও এইসব ঘটনার বৈজ্ঞানিক সমর্থন আজও পাওয়া যায় নি।

শোনা যাক সেই সব বিচিত্র কাহিনী। যুৎসই ব্যাখ্যা খোঁজা যাবে পরে।

পাথর ঃ

ভারী ভারী পাথর যখন আকাশ থেকে দমাদম করে আছড়ে পড়তে থাকে মাঠে, ঘাটে, বাড়ির ওপর তখন যে কোন মানুষেরই পিলে চমকে যাওয়া স্বাভাবিক। অথচ এরকম পিলেচমকানো ঘটনা ঘটে আসছে সুদূর অতীত থেকে।

যুদ্ধে জিতে যারা বিজয়োৎসবে মত্ত, তাদের ওপরেও তো পাথর বৃষ্টি হয়েছে। রোমের সৈন্যবাহিনী ছারখার হয়ে গেছিল আলবান পাহাড়ের কাছে (খ্রীস্টপূর্ব 672-640)।

আবার যারা শত্রুপক্ষকে অবরোধ করে বসে মজা দেখছিল —আকাশ থেকে পাথর আছড়ে পড়েছে তাদেরও মাথায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আবিসিনিয়ার সৈন্যবাহিনীকে এইভাবে আক্কেলসেলামী দিতে হয়েছে মক্কা অবরোধের সময়ে। লোকে বলে নাকি পাখির দল বয়ে এনেছিল ভারী ভারী পাথরগুলো।

তারপর যখন খবরের কাগজ আর পত্র-পত্রিকার যুগ এসে গেল, তখনও পাথর বৃষ্টি অব্যাহত থেকেছে পৃথিবীর নানান জায়গায়। ফলে খবর ছড়িয়েছে আরও তাড়াতাড়ি। 1860 সালের 19 জুলাইয়ের খবরেই জানা গেছে, বিষম ঝড়ের সময়ে রাশি রাশি কোণ বিশিষ্ট কালো পাথর এসে পড়েছিল ইংল্যাণ্ডের একটি অঞ্চলে। এত পাথর যে পরে বেলচার দরকার হয়েছে পাথর সরাতে।

পাথর বৃষ্টি থেকে খবরের কাগজের অফিসও রেহাই পায়নি। গরম গরম পাথর পড়েছে সাউথ ক্যারোলিনার 'নিউজ অ্যাণ্ড কোরিয়ার' কাগজের দপ্তরের ওপর 1886 সালের 4 সেপ্টেম্বর তারিখে। একবার নয়—বারবার—তিনবার। রাত আড়াইটে, সকাল সাড়ে সাতটা, আর দুপুর দেড়টার সময়ে। প্রচণ্ড বেগে পাথর নেমে এসেছিল নাকি দপ্তরের ঠিক ওপরের আকাশ থেকে—কয়েকটা পাথর ঠিকরে পড়েছিল ফুটপাথেও।

কাগজের অফিসের ওপর রাগ আছে অনেকেরই—কিন্তু অশান্ত আকাশ হঠাৎ এত চটিতং হল কেন, কে বলবে সেই রহস্য ?

গুদোমঘরের ওপরেও আকাশ একবার রেগে আগুন হয়ে গেছিল বলে জানা গেছে। ঘটনাটা ঘটে ক্যালিফোর্নিয়ার মত সুসভ্য অঞ্চলের চিকো শহরে। 1921 সালের জুলাই মাসে শুরু হয়েছিল পাথর বৃষ্টি—চলেছিল নভেম্বর পর্যন্ত। পাশা-পাশি দুটো গুদোমঘরের ওপরেই পড়েছে বেশির ভাগ পাথর। আকারে ডিমের মত দেখতে প্রতিটা পাথর এবং বেশ গরম। নির্মেঘ আকাশে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখা গেছে বিন্দুর মত পাথর—যত নিচে নেমেছে, ততই সুস্পষ্ট হয়েছে তার পরেই আছড়ে পড়ে ঠিকরে গেছে — আর দেখা যায়নি—মানে, পাথরটাকে খুঁজেই পাওয়া যায় নি! লেদ্যক মিরিয়াম অ্যালেন ফোর্ড এই ঘটনা বলেছিলেন নিজের চোখে দেখার পর।

ব্যাঙ

পাথর না হয় অজৈব পদার্থ, মেশিন-টেশিন দিয়ে ছোঁড়া যায়! কিন্তু ব্যাঙ হল গিয়ে কৃষ্ণর জীব, তাদেরকে কি এইভাবে আকাশে পাঠিয়ে দিয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় নিক্ষেপ করা যায়? অথচ এই হেঁয়ালীময় ঘটনাই ঘটে এসেছে যুগে যুগে বারবার। ফ্রান্সের ন্যাচারাল হিস্ট্রির এক কিউরেটর নিজের চোখে দেখেছেন, আচমকা মাটি ছেয়ে গেল আকাশ থেকে খসে পড়া ছোট ছোট ব্যাঙে (জুন 23, 1809)। এই ফ্রান্সেই আবার ব্যাঙ বৃষ্টি হয়েছে 1833 সালের জুন মাসে ঝাড়া দশ মিনিট ধরে—ছাতা দিয়ে শেষকালে মাথা বাঁচাতে হয়েছে! হয়েছে ইংল্যাণ্ডেও 1860 সালের জুলাই মাসে—আবার 1892-এর 30 জুন (সাদা ব্যাঙ ঃ বার্মিংহ্যামে), তারপরেও 1939-এর জুলাই মাসে (ছোট ব্যাঙ ঃ উইল্টশায়ারে)।

শিলাবৃষ্টি ঃ

যে শিলাবৃষ্টি দেখে আমরা অভ্যস্ত, এ কিন্তু তা নয়। চক্ষু চড়কগাছ করার মত।

ইটালির পাড়ুয়ায় এক ইঞ্চি প্লেটের মত শিলা বৃষ্টি ঘটেছিল 1834-এর 26 আগস্ট। কিছু প্লেটের এক পিঠ বক্র, স্বচ্ছ অথবা অনচ্ছ কিন্তু অপর পিঠে 45 ডিগ্রী কোণে রয়েছে চারদিকওলা ক্রস্ট্যাল (লম্বায় দেড় ইঞ্চি) ক্রস্ট্যালের ওপর চারদিকওলা একটা করে পিরামিড। কিছু প্লেটের ব্যাস দেড় ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি—

এদের কেন্দ্রে রয়েছে একটা করে নিউক্লিয়াস! ঝড়ের সময়ে অদ্ভুত শিলা পড়তে দেখা গেছিল নিউইয়র্কের সেন্ট লরেন্স নদীতে 1901 সালে। প্রথম ঝাঁকে নেমেছিল চোঙা আকারের পেন্সিল সাইজের শিলা। তার পরেই এল ওয়ালনাট বাদাম সাইজের শিলা, সবশেষে চাকতি আকারের শিলা। আধ-গলা অবস্থায় বেশ কিছু শিলা মানুষের চোখের আকার নিয়েছিল।

পেল্লায় শিলাখণ্ড বোমার মত বর্ষিত হয়েছিল হল্যাণ্ডে 1552 সালে। দেখে মনে হয়েছিল, যেন ফুটন্ত জলে ডোবানো ছিল শিলাখণ্ডগুলো—নেমে এসেছে যে মেঘের আড়াল থেকে তার দুর্গন্ধে বমি আসে।

জলন্ত বস্তু

কানফাটা আওয়াজের পরেই বিশ ফুট পরিধির একটা বরফের চাঁই খসে পড়েছিল স্কটল্যাণ্ডে—1849 সালে। স্বচ্ছ বরফের মধ্যে দিয়ে দেখা গেছিল অজস্র চৌকোণা এবং হীরক আকৃতির ক্রস্ট্যাল।

জার্মানীতে একজন ছুতোরমিস্ত্রী মারা গেছিল আচমকা ঘাড়ে বরফ খসে পড়ায়। কাজ করছিল নিজের বাড়ির ছাদে। ছ' ফুট লম্বা বরফ-চোঙার ব্যাস ছ' ইঞ্চি (10 জানুয়ারি. 1951)।

না, আকাশ থেকে জলন্ত জিনিসপড়া এমন কিছু তাজ্জব কাণ্ড নয়। রাতের আকাশে হামেশাই দেখা যায় জ্বলন্ত তারার খসে পড়ার দৃশ্য।

কিন্তু লেকের জল যখন রক্তলাল হয়ে যায় জলন্ত বস্তু এসে পড়লে? এবং তার পরেই শুরু হয় মড়ক?

ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছিল 1110 খ্রীস্টাব্দে—ভান সরোবরে। মিশরে শুরু হয়েছিল প্রথম প্লেগ মহামারী। নীলনদের জল রক্তে পরিণত হয়ে গেছিল।

1652 খ্রীস্টাব্দে আলোকময় উল্কা আছড়ে পড়েছিল ইটালিতে। আছড়ে পড়েছিল যেখানে, সেখানে পাওয়া গেছিল 'নক্ষত্র-জেলী'।

এই ভারতবর্ষের লোথি দ্বীপে আগুনের গোলা আছড়ে পড়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। পাওয়া গেছিল জিলেটিন জাতীয় পদার্থ। খবরটা বেরোয় এডিনবরা ফিলজফিক্যাল জার্নালে (অক্টোবর, 1819)।

1803 সালের 21 জানুয়ারি পোল্যাণ্ডে উল্কা আছড়ে পড়ার পর সে জায়গায় দেখা গেছিল রাশিকৃত জেলী জাতীয় পদার্থ।

নিউজার্সির ঘটনা। তারিখ ঃ নভেম্বর 13, 1833। আগুনে বৃষ্টির সঙ্গে আকাশ থেকে ডেলা ডেলা জেলী পড়তে দেখা গেছিল। কিছুক্ষণ পরে অদৃশ্য হয়েছে, মাটিতে পড়ে থাকা জেলী।

প্রায় দশ মিনিট ধরে এক নাগাড়ে যেন আগুন ঝরে পড়েছিল আকাশ থেকে ইংল্যাণ্ডের টেমস ডিটন গ্রামে এবং গন্ধকের পুরু আস্তরণ, জমে গেছিল গোটা গ্রাম (অক্টোবর, 18, 1867)।

আকাশ থেকে জলন্ত বস্তু খসে পড়ার পর সেখানে থক-থকে জেলী দেখা যায়—এমন ঘটনা বেশ কয়েকটা শোনা গেল। কিন্তু জেলীকে জীবন্ত অবস্থায় দেখা গেছিল ফিলাডেলফিয়ায় 1950 সালের 26 সেপ্টেম্বর। স্পন্দিত জেলী দেখে হতবাক হয়ে গেছিল দুজন পুলিশ অফিসার। টর্চের আলো নিভিয়ে দিতেই দেখা গেছিল আবছা বেগনি আভা ঠিকরে আসছে জেলীর ভেতর থেকে। প্রায় ছ ফুট ব্যাস অদ্ভুত সেই জেলী পিণ্ডর, প্রায় এক ফুট পুরু।

হতভম্ব অফিসাররা কিছু জেলী হাতে তুলে নিতেই তা উবে গেছিল—গন্ধহীন চটচটে একটা আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নি।

আধঘণ্টা পরে দেখা গেছিল, পুরো জেলীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে মাটির ওপর থেকে।

মাছ

মাছ বৃষ্টির ঘটনা কিন্তু অজস্র।

মোহনা থেকে 7-10 মাইল দূরে নোনাজলের মাছ আছড়ে পড়েছিল কাতারে কাতারে ইংল্যাণ্ডের কেণ্ট অঞ্চলে 1666 সালে ঈস্টারের আগের রবিবার। সাইজে কড়ে আঙুলের মত।

দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাণ্ডিজ অঞ্চলে ইম্বাবুরা নামে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। 1691 সালে অগ্ন্যুৎপাতের পরেই আশে পাশে মাছ ঝরে পড়েছিল আকাশ থেকে। এ খবর দেন জার্মান প্রকৃতিবিদ আলেকজাণ্ডার হামবোল্ট। তিনিই বলেন, 1698 সালের 20 জুন 18000 ফুট উঁচু কারগুয়ে-রাজো আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন, লাভা, পাথর ছিটকে আসার পরেই কুইটো অঞ্চলে মাছ বৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ।

স্কটল্যাণ্ড। 1817 সাল। প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল শিয়েন অঞ্চলে। তারপরেই অক্ষত অবস্থায় বিস্তর হেরিং মাছ পড়তে লাগল আকাশ থেকে। লোকে বলে, এ মাছ নাকি ঝড় উড়িয়ে এনেছিল 3 মাইল উত্তরের হ্রদ থেকে। মাছের গায়ে কিন্তু জল লেগে ছিল না একেবারেই।

আমেরিকান জার্নাল অফ সায়ান্স অ্যাণ্ড আর্টস-এর খবরে প্রকাশ (জুলাই, 1829)।

দশবারো দিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ার পর কেম্ব্রিজের মেরীল্যাণ্ডের একটা শুকনো খাতে দেখা গেছিল জল এবং মাছ। খাতের সঙ্গে নিকটস্থ নদীর কোন যোগাযোগ নেই।

'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' জানালে প্রথমে বাংলায় বেরোয় নিচের খবরটা এবং পরে ডিসেম্বর, 1833 সংখ্যায় অনূদিত হয় ইংরেজীতে ঃ

মাঠে কাজ করছিলাম, দুপুর বারোটায় আকাশ মেঘলা হল। একটু বৃষ্টিও হল। তারপরেই একটা বড় মাছ পড়ল আমার পিঠে। অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম আশেপাশে। চারপাশেই বড় বড় মাছ পড়ছে আকাশ থেকে। শোল, মৃগেল এবং আরও অনেক জাতের মাছ—সবই এই অঞ্চলেই পাওয়া যায় (শেখ চৌধুরী আমেদের সাক্ষ্য)।

শুক্রবার, ফাল্গুন মাস। দুপুর বারোটা। মাঠে কাজ করছি, হঠাৎ টের পেলাম আশপাশ আঁধার হয়ে গেল আকাশে মেঘ জমায়। একটু বৃষ্টিও হয়ে গেল। তারপরেই একটা বড় মাছ ঝপাস করে আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল। অবাক হয়ে ঢুকে গেলাম আমার কুঁড়েঘরে। বৃষ্টি থামতেই বেরিয়ে এলাম। আমার ঘরের আঙিনায় পঁচিশটা মাছ পেলাম—সবই এই অঞ্চলেই পাওয়া যায় (শেখ সুবুরুদ্দীনের সাক্ষ্য)।

এই ঘটনা ঘটেছিল ফরিদপুরে, 1830-এর 19 ফেব্রুয়ারি।

মাঠে কাজ করতে করতে মাছবৃষ্টিতে 'নেয়ে' গেছে ওয়েলস-এর ইংরেজ চাষীও। টুপি মাথায় দিয়ে কাজ করছিল জন লুইস (9 ফেব্রুয়ারী, 1859)। আচমকা রাশি রাশি মাছ পড়তে লাগল আশেপাশে। জ্যান্ত মাছ, তিড়িংমিড়িং করে লাফাচ্ছে শুকনো জমিতে। টুপির কিনারা ভরে গেল ছোট ছোট মাছে।

মাছেরা পড়েছিল দু-পশলা বৃষ্টির সময়ে।

1861 সালের 16 ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পরেই তুমুল বৃষ্টিপাত হয়েছিল। মাঠঘাট ভরে গেছিল আকাশ থেকে আছড়ে পড়া বড় বড় মাছে।

শ-য়ে শ-য়ে জ্যান্ত মাগুর, ট্রাউট আর পার্চ মাছ তুমুল বৃষ্টির সময়ে খসে পড়েছিল সাউথ ক্যারোলিনায় (জুন, 1901)। জলে পড়ে দিব্বি সাঁতার কেটেছে।

যে ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা হয় না

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলোয় আকাশ থেকে বিবিধ বস্তু খসে পড়ার যে জটিল প্রক্রিয়া উপস্থাপিত করা হয়, তা যেন আরও মাথা গুলিয়ে দেয়।

এ ছাড়াও আছে এমন অনেক ব্যাখ্যা, যা অব্যাখ্যাত রহস্যদের চাইতেও রহস্যময়।

তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এই ব্যাখ্যাগুলোকে অতি-পার্থিব, অতি-প্রাকৃত এবং সময়-বিবর্ত।

অতি-পার্থিব অনুমিতিতে বলা হয়, অন্য গ্রহের মহাকাশ যানগুলোই এইসব অত্যদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে চলেছে পৃথিবীময়। খুব সম্ভব বৈজ্ঞানিক অথবা রন্ধন সম্পর্কীয় কারণে (সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়,), ভূগোলক থেকে তারা বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করছে এবং ফের ফিরিয়ে দিচ্ছে। অথবা—হয়তো বাগান বা প্রাণীচর্চার ঊৎসাহে, কিম্বা, নিছকই আন্তঃগ্রহ উদারতার তাগিদে—অন্যগ্রহ থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানান বস্তু।

অতি-প্রাকৃত তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে, অধিদেবতা, অপদেবতা, প্রেতাত্মা, পোলটারজিস্ট, (বজ্জাৎ ভূত, যারা দিন দুপুরেও জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে ভাঙে, আওয়াজ করে), অথবা অন্যান্য নামহীন সত্তারা দায়ী আকাশ থেকে বিবিধ বস্তু ফেলার জন্যে। মাছ এনে ফেলে দেয় প্রয়োজন মেটাতে, কিম্বা নির্মেঘ আকাশ থেকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে বজ্জাতি করার জন্যে।

সময়-বিবর্ত তত্ত্বানুযায়ী, দৈর্ঘ্য-বেধ-উচ্চতা ছাড়াও অন্য মাত্রার (dimension) অন্য একটা জগৎ রয়েছে আমাদের পার্থিব জগতের সমান্তরাল অবস্থানে, মাঝে মাঝে আমাদের জগতের সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে এই জগতের। আর

ঠিক তখনই স্রোতাকারে মাছ, বরফ, পাথর, জেলী এসে ঢুকছে আমাদের জগতে।

তত্ত্বগুলো আরও হেঁয়ালীময়। কিছু সত্যি যদিও বা থাকে, তা আমাদের নাগালের বাইরে। যে শক্তির ফলে এইসব কাণ্ড ঘটছে, তাও অপরীক্ষিত।

আরও একটা তত্ত্ব গড়ে নেওয়া যেতে পারে নিচের দুটি ঘটনা থেকে ঃ

লণ্ডনের 'টাইম' কাগজের প্রতিবেদন (5 জুলাই, 1842) ঃ

কিউশার, স্কটল্যাণ্ড। 29 জুন। দুপুর সাড়ে বারোটা। আকাশ পরিষ্কার। বাতাস মৃদুমন্দ, বালতি করে কাপড় নিয়ে সবুজ মাঠে মেলে দিচ্ছিল একটি মেয়ে।

হঠাৎ মাথার ওপর প্রচণ্ড কানফাটা শব্দ। সেইসঙ্গে দমকা বাতাস। মাঠের ওপর মেলে দেওয়া সমস্ত কাপড় একসঙ্গে অনেক উঁচুতে উঠে উড়ে গেল দক্ষিণ-পুব দিকে—মিলিয়ে গেল দৃষ্টি সীমার বাইরে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ভারী জিনিসগুলো বেল্ট থেকে ছিঁড়ে, বা গিঁট খুলে গিয়ে সবেগে ধেয়ে গেল শূন্যে—কিন্তু পাহাড়ের দুপাশের হাল্কা জিনিসগুলো পড়ে রইল মাটিতে।

'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকার খবর (10 জুলাই, 1880 সংখ্যা) ঃ

ইস্ট কেণ্ট, অনটারিও! মিস্টার ডেভিড মিউকলে এবং মিস্টার ডব্লিউ ম্যাকে কাজ করছিলেন ক্ষেতে। আচমকা ভয়ানক আওয়াজ হল মাথার ওপর—ঠিক যেন গোলা ছোঁড়া হল কামান থেকে। সবিস্ময়ে দেখলেন দুজনে, প্রায় ষোল ফুট ব্যাস পরিমিত গোলাকার একটা জায়গার পাথর-গুলো মেঘের মত উঠে যাচ্ছে শূন্যে। ওই জায়গার বাইরের পাথর যেমনি তেমনি রয়েছে। কোন ভারী বস্তু পতনের শব্দ শোনা যায় নি। অথচ জমি পাথরশূন্য হয়ে গেছে। উল্কা, ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিঝড়ের জন্যে এ-কাণ্ড ঘটেনি—হলফ করে বলেছেন দুজনে।

এই দুটি ঘটনা থেকে মনে হয় নাকি, ভূগোলকের এক জায়গা থেকে বস্তু উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে অন্য জায়গায়?

ঘূর্ণিবাতাস আর জলস্তম্ভ

আকাশ থেকে বিবিধ বস্তু খসে পড়ার ন্যায্য ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা হয় ঘূর্ণিবাতাস আর জলস্তম্ভকে। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং বহু আবর্জনা সব সময়েই রয়েছে বাতাসে। ওজনে হাল্কা যারা, তাদেরকে সহজেই উড়িয়ে নেওয়া যায় পুকুর বা অন্য জায়গা থেকে।

কিন্তু যারা বেজায় ভারী? এ জন্যে দায়ী বড় আকারের ঘূর্ণিবাতাস, জলস্তম্ভ আর টর্নাডো—এদের উত্তোলন-শক্তি প্রচণ্ড। যেমন, টর্নাডোর চুঙ্গি বা ফানেলে বাতাস ঘুরপাক খায় ঘণ্টায় 170 থেকে 300 মাইল গতিবেগে এবং যে চাপ সৃষ্টি করে, তা পথিমধ্যে যে কোন জিনিসের ওপর প্রতি বর্গফুটে 300 পাউণ্ড, কি তারও বেশি।

এই শক্তির ফলেই টর্নাডো তুলো-চাপের কারখানা থেকে 675 পাউণ্ড ওজনের যন্ত্র উড়িয়ে নিয়ে যায় 900 ফুট দূরে (মিসিসিপি) ; 600 পাউণ্ড ওজনের কাঠের বরগা শূন্য পথে নিয়ে যায় সিকি মাইল দূরে (সাউথ ক্যারোলিনা) ; 75 পাউণ্ড ওজনের মুরগীর খাঁচাকে এক ঝাপটায় নিয়ে গিয়ে ফেলে চার মাইল দূরে ; গির্জের ছুঁচোলো চুড়োকে উড়িয়ে নিয়ে যায় 17 মাইল দূরে (ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র)।

জলস্তম্ভের কীর্তিকলাপও কম নয়। নরওয়ের একটা বন্দর চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেছিল ; বহু পুকুর খালি করে দিয়ে গেছে এমন ঘটনার অভাব নেই। ইংল্যাণ্ডের একটা হ্রদের সমস্ত মাছ যেন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল শুকনো ডাঙায়।

কিন্তু...

ঘূর্ণি বাতাস আর জলস্তম্ভের এত শক্তি বিশেষ বস্তুকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিশেষ জায়গায় বিশেষ সময়ে ফেলে কেন? পাথরের সঙ্গে অন্যান্য জিনিসও উঠে আসে না কেন? মাছের সঙ্গে জলজ উদ্ভিদ? মাপমত জায়গায় আছড়ে ফেলে কেন? হাল্কা জিনিস ফেলে রেখে ভারী জিনিস টেনে নেয় কেন? কখনো শুধু ব্যাঙকে বেছে নেয় কেন?

এ রহস্যগুলো থেকেই যাচ্ছে। কেন যে মাছ, ব্যাঙ, সাপেরা প্রচণ্ড ওই শক্তির মধ্যেও বেঁচে থাকে এবং অক্ষত থাকে, তাও জানা যাচ্ছে না।

'পরীর চুল' নাকি মাকড়শার জাল। বংশবিস্তারের জন্য 'বেলুন' প্রক্রিয়ায় শূন্যে জাল উড়িয়ে দেয় মাকড়শারা। প্যারাসুটের মত জাল নেমে পড়ে নতুন নতুন জায়গায়।

কিন্তু...

আজ পর্যন্ত কোন মাকড়শার জালে একটাও মাকড়শা দেখা যায় নি!

তবে কি ভিনগ্রহী আগন্তুকরা ভিন্ন রকমের চালিয়াতি চালিয়ে যাচ্ছে সবুজ গ্রহ পৃথিবীর ওপর?

কিন্তু ভিনগ্রাহীর অস্তিত্ব তো আজও বিজ্ঞানীরা খুঁজে পান নি।

[আগামী সংখ্যায়—**ভবিষ্যদ্বাণী রহস্য**।]

পরমাণু ঃ কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস

1. পরমাণু কাহাকে বলে ?

☐ প্রতিটি মৌলিক পদার্থ ক্ষুদ্রতম পদার্থকণা দ্বারা গঠিত। এইরূপ পদার্থকণাকে ভাঙ্গা যায় না, গড়াও যায় না এবং—ইহারা স্বাধীনভাবে প্রকৃতিতে থাকিতে পারে না। এইরূপ পদার্থকণাকেই পরমাণু বলা হয়। তবে বর্তমানে পরমাণুকে ভাঙ্গা যায় এবং ইহা প্রধানত তিনটি মূল কণার দ্বারা গঠিত।

2. অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য কি ?

☐ পরমাণু মৌলিক পদার্থের অবিভাজ্য সুক্ষ্মকণা, ইহার স্বাধীন স্বত্তা নাই। কিন্তু অণুযৌগিক ও মৌলিক পদার্থের এমন সুক্ষ্মকণা, যাহার স্বাধীন সত্তা বর্তমান এবং ইহাকে ভাঙিলে আর অণু থাকে না ইহা পরমাণুতে পরিণত হয়।

3. দুইটি মৌলের পার্থক্য কেমন করিয়া ঘটে ?

☐ দুইটি পরমাণু নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যার পার্থক্যের জন্যই মৌল দুইটির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। প্রোটন সংখ্যাকেই পারমাণবিক সংখ্যা বলে। এই পারমাণবিক সংখ্যাই প্রতিটি মৌলের মৌলিকত্ব নির্ধারক। সুতরাং বিভিন্ন প্রোটন সংখ্যা বিশিষ্ট পরমাণু—স্বভাবতঃই ভিন্ন ভিন্ন হইবে।

4. একটি মৌলের দুইটি ভিন্ন পারমাণবিক ওজন থাকিবার কারণ কি ?

☐ একই মৌলের অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের একই প্রোটন সংখ্যা বর্তমান এমন দুই বা ততোধিক পরমাণুতে যদি ভিন্ন ভিন্ন নিউট্রন সংখ্যা দেখা যায় তবে মৌলের প্রতিটি পরমাণু এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ভার বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ একই মৌলের দুইটি পরমাণু—নিউক্লিয়াসের নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার জন্যই উহাদের পারমাণবিক ওজন বিভিন্ন হয়। কারণ মৌলের ওজন বলিতে প্রোটন সংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে বুঝায়।

5. আয়ন কাহাকে বলে ?

☐ কোন পরমাণুতে যতগুলি প্রোটন থাকে তাহা অপেক্ষা যদি কম বা বেশি ইলেকট্রন উক্ত পরমাণুতে অবস্থান করে তবে সেই পরমাণুকে আয়ন বলে। প্রোটন অপেক্ষা পরমাণুতে ইলেকট্রন বেশি থাকিলে পরমাণুটি আনায়ন এবং কম থাকিলে পরমাণুটি ক্যাটায়ন হয়।

6. নিউক্লিয়াস বলিতে কি বুঝ ?

☐ পরমাণুর কেন্দ্রে যে ক্ষুদ্র স্থানে ইলেকট্রন ছাড়া পরমাণুর আর সকল পদার্থ ঘনিভূত অবস্থায় থাকে তাহাকে নিউক্লিয়াস বলে।

7. নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে সাদৃশ্য কি, পার্থক্যই বা কি ?

☐ নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে সাদৃশ্য হইল এই যে—উভয়ের ভর বা ওজন সমান। আর প্রার্থক্য হল নিউট্রনের কোন তড়িৎ আধান নাই। কিন্তু প্রোটন ধনাত্বক তড়িৎ আধান বিশিষ্ট কণিকা।

8 একটি প্রোটনের ভরের সহিত একটি নিউট্রনের ভরের সম্পর্ক কি ?

☐ একটি নিউট্রনের ভর, একটি প্রোটনের ভর ও একটি ইলেকট্রনের ভরের যোগফল। ইহাই সম্পর্ক।

9 পরমাণুর ঋণাত্মক তড়িৎ বিশিষ্ট কণিকা কি এবং উহাদের সংখ্যা কত ?

☐ পরমাণুর ভিতরের ইলেকট্রনই হইল ঋণাত্মক তড়িৎ আধান বিশিষ্ট কণা। এই ইলেকট্রন কণার সংখ্যা নির্ভর করে পরমাণুতে কয়টি প্রোটন আছে তাহার উপর। কারণ প্রতিটি মৌলের পরমাণুতে যতগুলি প্রোটন থাকে ঠিক ততগুলিই ইলেকট্রন থাকে।

10. কোন্ পরমাণুর ভর সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা এক ?

☐ হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর সংখ্যা ও পারমাণবিক সংখ্যা সমান। কারণ—হাইড্রোজেনের পরমাণুতে কোন নিউট্রন নাই, কেবল একটি প্রোটন বর্তমান। সুতরাং প্রোটনের সংখ্যাই এক্ষেত্রে ভর সংখ্যা।

11. পারমাণবিক ওজন ও ভর সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কি ?

☐ (i) কোন মৌলের একটি পরমাণু একটি কার্বন পরমাণুর ওজনের এই অংশের তুলনায় যত গুণ ভারী সেই সংখ্যাই উহার পারমাণবিক ওজন। কিন্তু ভর সংখ্যা হইল পরমাণুটির নিউক্লিয়াসে অবস্থিত মোট প্রোটন ও নিউট্রনের মিলিত সংখ্যা।

(ii) কোন মৌলে কতগুলি আইসোটোপ থাকিলে উহাদের ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়, কিন্তু উহাদের বিভিন্ন পারমাণবিক ওজনের গড় লইয়া মৌলটির পারমাণবিক ওজন স্থির করা হয়। এই কারণে পারমাণবিক ওজন ভগ্নাংশ হইতে পারে, কিন্তু ভর সংখ্যা সর্বদা পূর্ণ সংখ্যা হয়।

12. যখন একটি ইলেকট্রন একটি আবর্তন কক্ষ হইতে অপর আবর্তন কক্ষে যায় এবং যখন একটি ইলেকট্রন বাহিরের কক্ষ হইতে অপসারিত হয় তখন কি হয় ?

☐ যখন একটি ইলেকট্রন একটি কক্ষপথ হইতে আর একটি কক্ষে লাফাইয়া যায় তখন সে কিছু পরিমাণ শক্তি ছাড়িয়া দেয় বা শক্তি শোষণ করে।

আর যখন ইলেকট্রন বাহিরের কক্ষপথ হইতে অপসারিত হয় তখন উহা ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়।

13. হাইড্রজেন পরমাণুর ভর একটি প্রোটনের ভরের প্রায় সমান—ইহা বলিবার হেতু কি ?

☐ হাইড্রজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে প্রোটন বলা হয়। কারণ হাইড্রজেন পরমাণুতে কেবলমাত্র একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রন থাকে। যখন পরমাণুর ইলেকট্রনটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তখন ইহার নিউক্লিয়াসটিই পড়িয়া থাকে। ইহা প্রোটন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই হাইড্রজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে প্রোটন বলা হয়।

14 পারমাণবিক কথাগুলির ভর গ্রামে প্রকাশ কর।

☐ প্রোটনের ভর একটি হাইড্রজেনের পরমাণুর ওজনের প্রায় সমান। গ্রাম এককে ঐ ওজন হইল $1{\cdot}675 \times 10^{-24}$। নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের সমান।

15. মৌলের পরমাণুর ধর্ম কার উপর নির্ভর করে ?

☐ মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যার উপর মৌলের পরমাণুর ধর্ম নির্ভর করে।

16. নিউক্লিয়াসের ভিতর একাধিক প্রোটন একত্রে কিরূপে অবস্থান করে ?

☐ নিউক্লিয়াসের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে একাধিক ধনাত্মক তড়িৎ আধান বিশিষ্ট প্রোটন থাকায় স্বভাবতঃই উহারা পরস্পরে বিকর্ষণ করে। দেখা গিয়েছে যে নিউক্লিয়াসের ভর উহার মধ্যকার কণাগুলির মোট ভর অপেক্ষা সামান্য কম হয়। আইনস্টাইনের মতবাদ অনুসারে ঐ হারিয়ে যাওয়া ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া নিউট্রন ও প্রোটন-গুলিকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে একত্রে ধরিয়া রাখে।

17. পরমাণুর ভরের পরিবর্তন হয় কেন ?

☐ কোন মৌলের পরমাণুগুলির নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিউট্রনের সংখ্যার বিভিন্নতা দেখা দিলে উহাদের ভরের পরিবর্তন হয়।

18. ${}_8O^{16}$ লিখিয়া কি বুঝানো হয় ?

☐ ${}_8O^{16}$ দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে অক্সিজেন (O) পরমাণুর পারমাণবিক ওজন 16 এবং পারমাণবিক সংখ্যা হল 8।

19. ${}_{22}A^{29}$ হইতে বল A মৌলটি ধাতু না অধাতু ? ইহার যোজ্যতা কত ?

☐ ${}_{22}A^{29}$ হইতে বোঝা যায় A নামক মৌলটির প্রোটন সংখ্যা তথা ইলেকট্রন সংখ্যা 22। অর্থাৎ ইহার ইলেকট্রন বিন্যাস 2. 8. 10. 2 ইহা হইতে স্পষ্ট যে উক্ত মৌলটির বহিঃকক্ষের দুইটি ইলেকট্রন বর্তমান। উক্ত মৌলটির পক্ষে দুইটি ইলেকট্রন দান করিয়া বহিঃকক্ষে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ন্যায় ইলেকট্রন গঠন করা সম্ভব। ইলেকট্রন দান করিয়া যোজ্যতা অর্জন কেবল মাত্র ধাতু বা ধাতুধর্মী মৌলই করিতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রেও A মৌলটি ধাতু। ইহার যোজ্যতা—2।

20. আর্গন গ্যাসের পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষে মোট কয়টি ইলেকট্রন আছে ?

☐ 8টি।

21, পারমাণবিক ওজন ভগ্নাংশ হওয়ার কারণ কি ?

☐ কোনো মৌলের দুই বা ততোধিক আইসোটোপ বিভিন্ন অনুপাতে থাকিলে উহাদের গড় হইতে মৌলটির পারমাণবিক ওজন স্থির করা হয়। তাই এইরূপ ক্ষেত্রে পারমাণবিক ওজন সংখ্যাটি ভগ্নাংশের আকারে হইতে পারে।

22. হাইড্রোজেনের আইসোটোপগুলির নাম লেখ।

☐ হাইড্রজেনের তিনটি আইসোটোপ। যথা—সাধারণ হাইড্রোজেনের (${}_1H^1$) ডয়টেরিয়াম (${}_1D^2$) এবং ট্রিয়-টেরিয়াম (${}_1T^3$)।

23. নিম্নলিখিত মৌলগুলির পরমাণুতে অবস্থিত কণার সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

মৌল	প্রোটন সংখ্যা	ইলেকট্রন সংখ্যা	নিউট্রন সংখ্যা
A	8	10	7
B	8	8	8
C	12	10	12
D	8	8	9
E	18	18	22

ইহাদের মধ্যে কোনটি (i) ধনাত্মক আয়ন, (ii) নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণু (iii) ঋণাত্মক আয়ন এবং (iv) কোন্‌গুলি আইসোটপ।

☐ A—ধনাত্মক আয়ন, C— ধনাত্মক আয়ন E—নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণু. B এবং D পরস্পরের আইসোটোপ

24. টীকা লিখ ? (a) তড়িৎ যোজ্যতা।

☐ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মত ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের চেষ্টায় একটি পরমাণুর শেষ স্তরের ইলেকট্রন অন্য পরমাণুর শেষ ইলেকট্রন স্তরে স্থানান্তরিত হয়ে তড়িৎ আকর্ষণের সাহায্যে যৌগ গঠনের ক্ষমতাকে তড়িৎ যোজ্যতা বলে।

গ্রাম+পোঃ—হাসান, জেলা—পঃ দিনাজপুর, পিন-733209

ছাগল সমাজ ও গায়ের গন্ধ

গীতা মিত্র

14ই-সেপ্টেম্বর 1987 সাল দুপুরে কালো ছাগল দুটো বাচ্চা দিল। একটা খয়েরী একটা সাদা। সাদাটা জন্মাবার কয়েক মিনিট পরেই মারা যায়। সুতরাং কালো ছাগলের শুধুমাত্র খয়েরী সন্তান বেঁচে থাকে। এই সন্তানটি ছিল পুরুষ। কালো ছাগল দ্বিতীয় সন্তানটিকে ভুলে যেতে চেষ্টা করে এবং প্রথম সন্তানটিকে লালন-পালন করতে শুরু করে। ছাগলরাও বুঝতে পারে তাদের বাচ্চার মৃত্যু। তারাও দুঃখ পায়, কাঁদে, এবং ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করে সত্যিই তাঁর সন্তানের মৃত্যু হয়েছে কিনা। কারণ—কালো ছাগলটা একবার করে তার মরা বাচ্চাটার কাছে যাচ্ছে তাকে চাটছে, আবার পা দিয়ে তার শরীরটাকে নাড়াবার চেষ্টা করছে, এরপর কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে মুখটা উঁচু করে ডেকে উঠছে। তখন তাকে দেখে মনে হয় সে যেন ডুকরে কেঁদে উঠছে। তারপরে সে আবার জীবিত সন্তানের কাছে ফিরে এসে তাকে চাটে এবং মুখ দিয়ে টেনে কোলের কাছে নিয়ে গিয়ে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করে। ছাগলের বাচ্চা জন্মাবার পর এক ঘণ্টার মধ্যেই উঠে দাঁড়ায়, মাকে চেনে এবং মায়ের দুধ নিজেরাই খেতে শুরু করে। (অবশ্য সুস্থ সন্তান হলে)। সুতরাং কালো ছাগল তার জীবিত সন্তানটিকে নিয়েই তার তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থাকে। মা-ছেলের এই পারিবারিক জীবনে অকস্মাৎ আর একজনের আবির্ভাব হয় তার পরের দিন অর্থাৎ 15ই সেপ্টেম্বর।

এর আগে বলে রাখা দরকার, গৃহপালিত ছাগলদের ক্ষেত্রে পরিবার বলতে মা আর ছেলে কিম্বা মেয়ে, এই নিয়েই এদের পরিবার। অন্যান্য অনেক জীবজন্তুর বেলায় দেখা যায় বাবা ও মা দুজনে মিলে তাদের সন্তানদের লালন-পালন করে। কিন্তু গৃহপালিত ছাগলের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকাই প্রধান। মায়ের পরিচয়ই এদের পরিচয়। কারণ এদের কোন সন্তানই জন্মে বাবাকে দেখতে পায় না। কারণ আমাদের সমাজে এতদিন পর্যন্ত তার বাবাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। যদিও ছাগলের গর্ভচ্যুত হতে সময় লাগে ছয়মাস। একটি পুরুষ ছাগলের পৌরষত্ব আসতে সময় লাগে ছয় থেকে সাতমাস বয়স। তারপর কোন স্ত্রী-ছাগলের সঙ্গে মিলিত হয়। একটা স্ত্রী-ছাগল গর্ভচ্যুত হবার চারমাস পর আবার গর্ভবতী হয়। সুতরাং স্ত্রী-ছাগলের মিলনের একটা নির্দিষ্ট সময় আসে। এই সময় এরা মূত্রের সঙ্গে একপ্রকার গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। পুরুষ ছাগল মিলিত হবার পূর্বে স্ত্রী-ছাগলের মূত্রের মধ্যে এই গন্ধ পায় এবং বিশেষ ধরনের মুখভঙ্গি অর্থাৎ ফ্লেমেন (Flehmen) করে। ফ্লেমেন করার সময় এরা মুখটাকে সামান্য হাঁ করে জিহ্বাটাকে সামান্য বের করে, এবং এই সময় নাকটাকে কুঁচকে মুখটাকে উপর দিকে তুলে এমন ভাবে নিশ্বাস নেয় এবং মুখভঙ্গি করে, যেন কোন কিছুর একটা গন্ধ অনুভব করছে। এরপর এরা কুকুর, বাঘ বা এই জাতীয় প্রাণীদের মত তাদের মূত্রটা স্ত্রী-ছাগলের মূত্রের উপর পিচকারীর মত ছিটিয়ে দেয়। তবে এরা কুকুর বা বাঘের মত পা তুলে ছেটায় না। এরপর একটি স্ত্রী-ছাগলের সাথে একটি পুরুষ ছাগলের মিলন ঘটে। এই মিলনের পর যখন স্ত্রী ছাগলটি সন্তান প্রসব করে, তখন পুরুষ ছাগলটির বয়স দাঁড়ায় এক বছর। ততদিন পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। কারণ আট থেকে নয় মাস বয়েসেই খাদ্য হিসাবে মানুষ এদের খেয়ে ফেলে।

এবারে আসি 15ই সেপ্টেম্বরের কথায় আসছি। এই দিন দুপুরে আর একটি খয়েরী ছাগলের বাচ্চা হল। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি। উঠানের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। মাথার উপর বৃষ্টি অথচ যে পরিস্থিতি তাতে ঠিক সেই সময় ওখান থেকে সরানো সম্ভব নয়। সুতরাং বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খয়েরী মা একটি পুত্র সন্তান লাভ করল। আমার মা ভাবলেন সদ্যোজাত শিশু ছাগলের গায়ে যদি বৃষ্টির জল লাগে তাহলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না। তাই ছাগলটি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মায়ের কাছে শিশুটিকে না দিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় তুলে দেন। এরপর অল্পকিছু সময়ের মধ্যেই খয়েরী মা আরো দুটি সন্তান প্রসব করে। বৃষ্টির জল লাগায় অথবা দুর্বল হওয়ায় জন্মাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এদের মৃত্যু ঘটে।

এদিকে 'কালো মা' ছাগলটি বারান্দায় একটি সদ্যোজাত সন্তানকে দেখতে পেয়ে কাছে ছুটে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে চাটতে শুরু করে এবং নিজের সন্তানের মত তাকে তত্ত্বাবধান করে। খয়েরী ছাগলের বাচ্চা প্রথম কালো মা-ছাগলের গন্ধটাকেই গ্রহণ করে এবং যথাসময়ে উঠে কালো ছাগলের দুধ খেতে শুরু করে এবং তাকেই মা বলে গ্রহণ করে। চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে গায়ের গন্ধের সম্পর্কই প্রধান। অন্যদিকে 'খয়েরী মা-ছাগল' জানে না যে তার একটি সন্তান এখনও জীবিত আছে। সে জানে তার দুটি সন্তান হয়েছিল এবং সেই দুটি সন্তান মারা গেছে। তাই

সে সমস্ত বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কেঁদে বেড়ায় আর নিজের সন্তানদের খুঁজে বেড়ায়। ছাগলরা বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে বুঝতে পারে। মরা বাচ্চাটাকেও তারা নিজের বাচ্চা বলে জানে। তাই তারা একদিন-দুদিন খোঁজে এবং ডেকে বেড়ায়। অন্যদিকে বাচ্চা হবার সঙ্গে সঙ্গে বাটে দুধ এসে যায় সেই যন্ত্রণায়ও তারা অস্থির হয়ে ওঠে। কালো ছাগলকে প্রকৃতি যেন একটি সন্তান দান করলেন। সেই সঙ্গে আর একজনকে করলেন সন্তান হারা, কালো ছাগলের এখন দুটো ছেলে। ঐদিনই বিকেলের দিকে খয়েরী ছাগলের কাছে তার নিজের বাচ্চা দেওয়া হল। বাচ্চাটা এগিয়ে গিয়ে মায়ের বাটে মুখও দিল কিন্তু মা তাকে চিনতে পারলো না। সে শিং দিয়ে গুতিয়ে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল। বাচ্চাটা এখনও কোন কোন সময় খয়েরী মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ভুল করেই হোক অথবা সহজাত প্রবৃত্তিতেই হোক বাঁটেও মুখ দেয়। কিন্তু তার মা কোন সময়ই তাকে নিজের সন্তান বলে ভাবতে পারে না। সব সময় তাকে তাড়িয়ে দেয়। আর একটা বিষয় আমি দেখতে পাই কালো ছাগলের নিজের যে বাচ্চা আছে সে কিন্তু কখনও ভুল করেও খয়েরী মা-ছাগলের কাছে যায় না। অথচ খয়েরী ছাগলের বাচ্চা কালো ছাগলকেই মা বলে জানে তারই দুধ খায় এবং তার ডাকেই সাড়া দেয়। তবুও সে মাঝে মাঝেই খয়েরী মায়ের কাছে যায় এবং তার দুধ খাওয়ার চেষ্টা করে। আমার মনে হয় ভ্রূণ অবস্থায় থাকার সময় মায়ের যে গন্ধটা তার শরীরে ছিল সেটা সে তখনও পর্যন্ত ভুলতে পারেনি বলেই খয়েরী ছাগলের কাছে যায়। আরও লক্ষ্য করেছি এই প্রবৃত্তিটা তার জন্মাবার পর থেকে অল্প কিছুদিন পর্যন্ত খুব ছিল এবং এবার থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকে। একমাস পর থেকে তাকে আর খয়েরী ছাগলের কাছে যেতে দেখা যায় না। তাতে আমার মনে হয় গন্ধটা আস্তে আস্তে সে ভুলে গেছে। এখন ডিসেম্বর মাস। এদের বয়স চার মাস। এরা সবে দু-একটা ঘাস খেতে শিখেছে। এখনও এদের উপর নজর রাখছি।

68/143 যশোহর রোড, অমরপল্লী, কলিকাতা-74

বিজ্ঞানসাধক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সপ্তম বার্ষিক স্মরণ সভা

'গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার যে সূচনা করেছিলেন, আজকের দিনে আমাদের তাঁর পতাকাবাহী হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শুধুমাত্র তাঁর স্মরণ সভায় সমবেত হয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না।' —গত ৪ এপ্রিল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মরণ সভায় একথাগুলো বলেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী নারায়ণ সান্যাল। স্মারক বক্তৃতায় শ্রী সান্যাল লেখক ও প্রকাশকদের উদ্দেশে বলেন যে, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় ও প্রকাশে তাঁদের আরও তথ্যনির্ভর হতে হবে।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি ও কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকা।

অনুষ্ঠানের সুরুতে বিজ্ঞান সাধকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডঃ জয়ন্ত বসু ও প্রাক্তন উপাচার্য সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

স্বাগত ভাষণ দেন ডঃ সুকুমার গুপ্ত। সেদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে প্রদর্শিত "গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য" শীর্ষক রঙিন তথ্যচিত্র। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শর্মিষ্ঠা গুপ্ত।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

মে, 88 VII-VIII

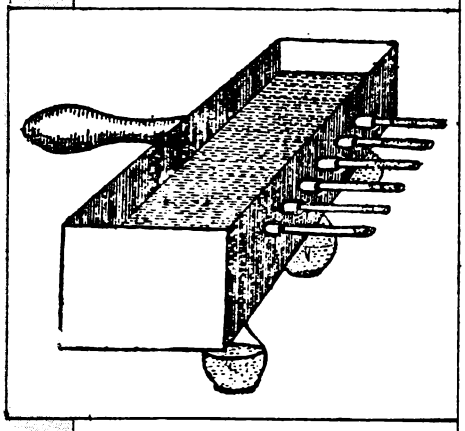

1. এই পরীক্ষাটির দ্বারা বিজ্ঞানে কোন্ সত্য প্রমাণিত হয় ?
2. 'ইটানগর' ভারতের কোন্ রাজ্যের রাজধানী ?
3. পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম স্থান কোনটি ?
4. কিংবিখ্যাত নদী নিম্নস্থ সুড়ঙ্গপথ কোথায় আছে ?
5. মহাদেশীয় ভূত্বকের অপর নাম কি ?
6. ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় কবে ?
7. চুম্বকের কোন্ কোন্ মেরুর মধ্যে আকর্ষণ ঘটে ?
8. নাইট্রিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনগত অনুপাত কতো ?
9. সাদা বস্তুর তাপ শোষণ ও বিকিরণ ক্ষমতা বেশি না কম ?
10. মহীন্দ্র ও মহীন্দ্র কোম্পানী ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত এবং ঐ কোম্পানীতে কি তৈরি হয় ?

গ্রেড II

মে 88 IX-X

1. হুগলী জেলার 'রাধানগর'-এ এক বিখ্যাত বাঙ্গালী সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কে ?
2. আমার স্বদেশের প্রতি (To my native land) শীর্ষক কবিতাটির রচয়িতা কে ?
3. পৃথিবীর উচ্চতম আগ্নেয়গিরি কোন্‌টি ?
4. Lapis Lazuli একটি মূল্যবান রত্ন। এর বাংলা নাম কি ?

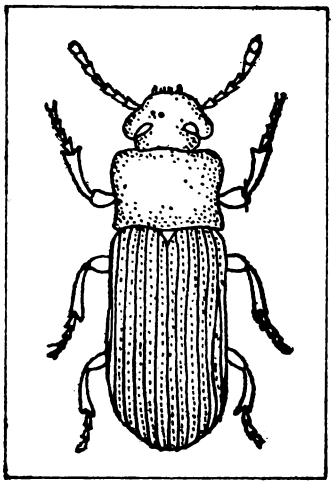

5. ফসলের ক্ষতিকর এই পোকাটির নাম কি ?
6. 'ফ্লোগোপাইট' কি ?
7. VISCO - পুরো নামটি কি ?
8. "ইকো-সিস্টেম" শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন ?
9. 'ডিপনয়' নামক এক প্রকার মাছের ফুসফুস আছে। এদের কোন্ কোন্ দেশে দেখতে পাওয়া যায় ?
10. ফরাসী দেশের জাতীয় পুষ্পের নাম কি ?

গ্রেড III

মে, 88 XI-XII

1. পেট্রোলিয়ম উৎপাদনে বিশ্বে কোন্ দেশ প্রথম স্থান অধিকার করেছে ?
2. বিশ্বের সর্ববৃহৎ মৎস্য শিল্প কেন্দ্র কোনটি ?
3. ভারতে যে কটি আঞ্চলিক রেলপথ আছে, তার মধ্যে কোন্ রেলপথের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক ?
4. কোথায় সর্ব প্রথম শীতকালীন অলিম্পিকস অনুষ্ঠিত হয় ?
5. বাদুড়ের ডিমের রঙ কেমন ?
6. পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব ঘটে কার।
7. ভরতপুর অভয়ারণ্য ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?
8. উড়ুক্কু মাছ, উড়ুক্কু সাপ, উড়ুক্কু ব্যাঙ সত্যিই এরা উড়তে পারে ?
9. সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ভাই ?
10. ফসলের ক্ষতিকর এই পোকাটির নাম কি ?

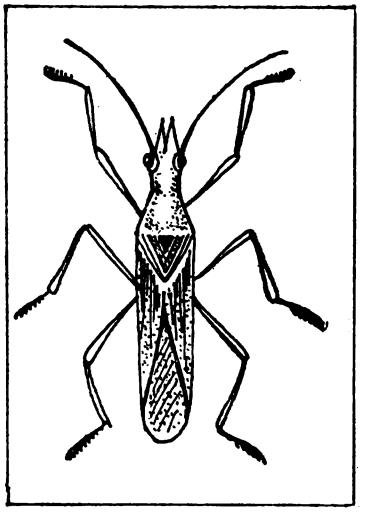

গুবরে পোকা—টাইটান

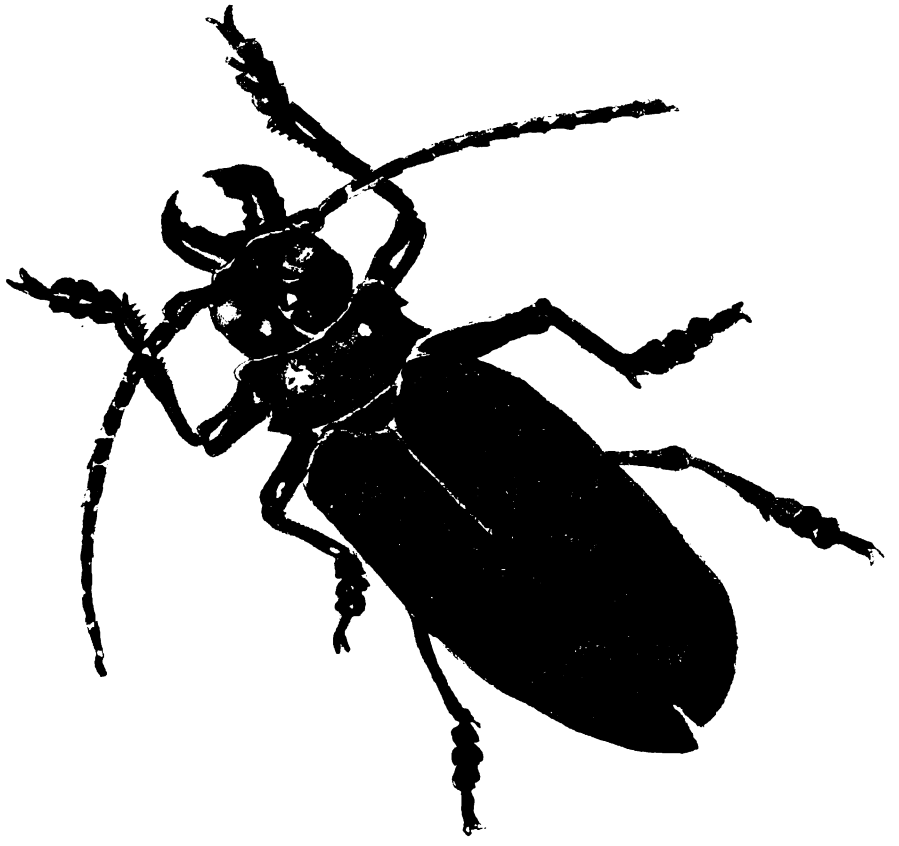

কীটপতঙ্গের জগতে এক বিশাল জায়গা দখল করে আছে গুবরে পোকা। অন্যান্য কীটপতঙ্গের থেকে এই গুবরে পোকাদের একটা আলাদা শারীরিক বৈশিষ্ট্য আছে। এদের মূল পাখনার ওপরে আছে এক জোড়া শক্ত পাখনা (এগুলোকে এলিট্রা বলে) যেগুলি বর্মের মত শক্ত। এই দিয়ে এরা শরীরকে রক্ষা করে। এদের বাইরের আবরণ এত শক্ত যে এরা কীটপতঙ্গের জগতে 'নাইট' হিসেবে পরিচিত। শরীরের এই বাহ্যিক আবরণের সাহায্যে এরা সমস্ত আঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

পৃথিবীতে অন্ততঃপক্ষে চার লাখ প্রজাতির গুবরে পোকা আছে। এদের কেউ কেউ লম্বায় ১ মিলিমিটার আবার কেউ 20 সেন্টিমিটার। গুবরে পোকাদের এই বিশাল প্রজাতির মধ্যে সব থেকে বড় হল টাইটান। বৈজ্ঞানিক নাম টাইটানাস জাইগানটাস (Titanus giganteus) মাথার শুড় বাদ দিয়েই লম্বায় 20 সেমি। এই টাইটান প্রথম দেখতে পাওয়া যায় আমাজন নদীতে মৃত অবস্থায়। এবং বহু খোঁজাখুঁজির পর 1950 সাল অবধি মাত্র 40টি নমুনা সংগ্রহ করা গিয়েছিল। 1972 সালে ব্রাজিল—আমেরিকার এক যুগ্ম সংস্থা অনুসন্ধান চালিয়ে এই গুবরে পোকার বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে তাদের জীবন চরিত্র সম্বন্ধে অল্প কিছু জানতে পারলেও বেশির ভাগটাই এখনো অজানা আছে।

গুবরে পোকার বৈচিত্র্যময় চেহারা ও ক্রিয়া-কলাপ নিয়ে পরে আরো বলবো।

অলয় ঘোষাল

শঙ্খপ্রতিম ভট্টাচার্য মে '৪৪

পাশাপাশি ঃ 1. প্রজাপতির লার্ভা। 3. নার্ভাস কোট দ্বারা আবৃত চোখের একটি স্তর। 5. প্রতিসরাঙ্ককে যাহা দ্বারা প্রকশ করা হয়। 6. $\frac{2}{7}$। 10. গাছের একটি রেচন পদার্থ। 11. বৃক্ষের একক।

উপর নিচ ঃ 1. কর্ণছত্র, 3. যে নালী দিয়ে রক্ত বৃক্কে আসে, 5. অযৌন জনন করে এমন একটি ছত্রাক। 4. আমেরিকার একটি মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। 2. যে বিজ্ঞানীর সূত্রের উপর হাইড্রোলিকপ্রেসের কার্যনীতি প্রতিষ্ঠিত। 8. যারা বসু-আইনস্টাইন আখ্যা মেনে চলেন। 9. "হিভা" পর্বত কোন দেশে অবস্থিত? 7. C H

কোয়ার্টার নং E/10, Unit-3, গোলবাজার, খড়্গপুর মেদিনীপুর।

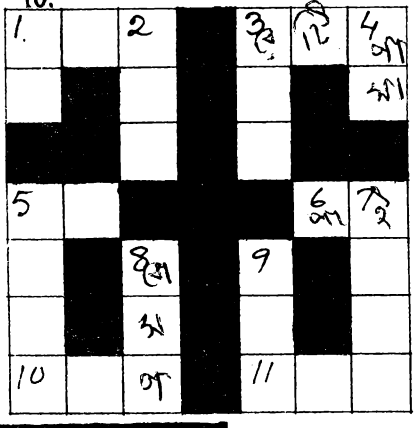

আই কিউ টেস্ট মে '৪৪

1. পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে—
   1, 2, 3, 5, 7, 11,...
2. নিচের অ্যাসিডগুলির মধ্যে কোনটি উচ্চ আণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন—
   (a) নাইট্রিক অ্যাসিড, (b) সালফিউরিক অ্যাসিড, (c) স্টিয়ারিক অ্যাসিড।
3. নিচে উল্লেখ করা কাজগুলির মধ্যে কোনটিতে পরিবর্তী প্রবাহ ব্যবহার করা যায় না—
   (a) তাপন, (b) আলোকন, (c) বিভব পরিবর্তন, (d) তড়িৎ লেপন।
4. একদিন রাস্তা থেকে তুমি দু'শ টাকা পেলে, টাকাটা তুলে নিয়ে তুমি কী করবে—
   (a) একজন দরিদ্রকে দান করবে,
   (b) তোমার টাকার খুব প্রয়োজন; তাই সেটা তুমি পকটস্থ করবে।
   (c) কাকাকাছি কোন থানায় জমা দেবে।
   d) টাকা যেখানে আছে সেখানেই ফেলে রেখে তুমি চলে যাবে।
5. যদি BAD শব্দটি দিয়ে 214 বোঝায়, তাহলে DAD শব্দটি দিয়ে কোন সংখ্যাটি বোঝাবে?

মার্চ' ৪৪ গ্রেড I

1 মানবদেহের হৃদ্‌পিণ্ডের ছবি। 2. "হে নূতন দেখা দিক আর বার। 3. গ্রহের আলো স্থির। 4. পারদ। 5. মনিবের খাস জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে চাষ করা। 6. সপ্তম বৃহত্তম দেশ। 7. ভলগা নদী। এডিলেড। 9. স্পুতনিক। 10. মহাত্মা গান্ধী।

মার্চ 88 গ্রেড II

1. $9{\cdot}45 \times 10^{15}$ মিটার। 2. ছিপের এক প্রান্তে, হাতে। 3 এক জুল 10^{7} আর্গ। 4. ন্যানোমিটার একক। 5. নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন। 6. পঁয়ত্রিশ বছর। 7. প্রজাদের জমির সীমা, স্বত্ব ও মালিকানা ইত্যাদি উল্লেখ থাকতো। 8. মিহির ভোজ। 9. আরতি সাহা, 1960 খ্রীস্টাব্দে। 10. চোমো লহরি।

মার্চ 88 গ্রেড III

1 1665 খ্রীস্টাব্দে। 2. Computer Aided Design 3. ETHNOLOGY. 4. TIROS-I 5. কাভালুর (তামিলনাড়ু)' ভারতবর্ষ। 6 TETRA-FLUORO ETHYLENE 7. প্রায় 74 8 চন্দ্র শেখর ভেঙ্কটরামন। 9. A. A. MICHAELSON. 10. বাঁ দিকে জলঘড়ি (CLEPSYDRA), মাঝখানে মোমবাতি ঘড়ি (নবম শতাব্দীর), ডান দিকে তেলের প্রদীপ ঘড়ি (ষোড়শ শতাব্দী)।

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই কিউ টেস্ট / মার্চ '৪৪-এর সমাধান

1. MEAT 2 (b) 3 3 (d) চাপ
4. জল বাদে বাকী সবকটি শক্তির বিভিন্ন রূপ।
5. 79. ওপরের সংখ্যার সঙ্গে 21 যোগ করে নিচের সংখ্যা পাওয়া যায়।

শব্দকূট সমাধান

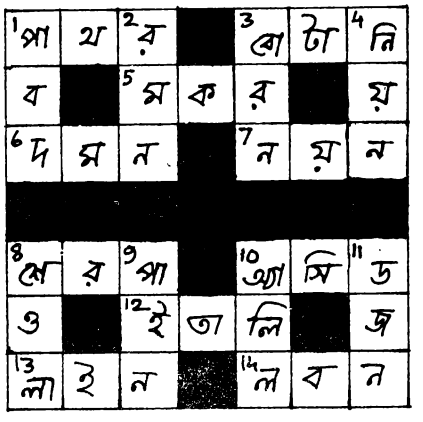

বজ্র নিরোধক

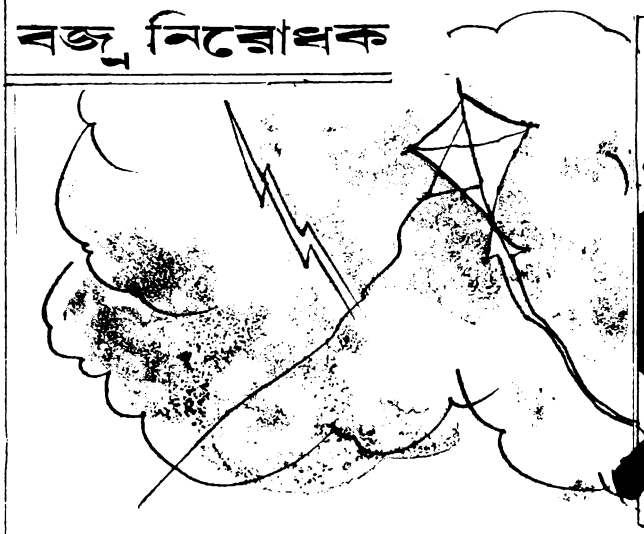

গতকাল সন্ধেবেলা হঠাৎ মেঘ করে প্রচণ্ড ঝড়, জল ; সেই সঙ্গে বাজ। তাই দেরী না ক'রে ছাদে উঠেছিলাম সকালবেলাতেই বজ্র নিরোধক রডটাকে ঠিক ক'রে লাগাবার জন্য। এক মনে কাজ করছি, হঠাৎ কোথা থেকে জিজা দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার গায়ের ওপর, "কাকু কি করছো ?" আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বিস্ময়ে চোখ বড় বড় ক'রে বলল, "ওমা, কাকু তুমি বুঝি মাছ শিকার করতে যাবে, নিগ্রোদের মত ?" আমি ওর কথা একদম গ্রাহ্য করলুম না। জিজা নিজের মনেই বলতে শুরু করল, "তোমার নৌকা আছে ? কোন নদীতে যাবে তুমি ? আমাকে সঙ্গে নেবে ?" আমি ঘাড় ফেরালুম জিজার দিকে, "কি বকছিস তুই যা তা ?" জিজার দিকে নজর দিতেই-ও বুঝিয়ে দিল ওর জ্ঞানের বহর ; "হুঁ, হুঁ, বাবা, আমি জানি ঐ দিয়ে ফিসিং করে।" ফিসিং বলতেই সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলুম পাঠ্য পুস্তকের গুণে জিজা আমার বজ্রনিরোধক আর মাছ ধরার খোঁচাকে একাকার করে ফেলেছে। আমি হেসে বললুম, হাঁদারাম, একটা গল্প শুনবি ?" গল্প শোনার লোভে অপমান সহ্য ক'রে বলল, "হ্যাঁ, শুনবো।"

1753 সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে একজন বৈজ্ঞানিক ভেবেছিলেন আকাশে যে বজ্র দেখা যায় তার মধ্যে নিশ্চয় বিদ্যুৎ আছে। সত্যিই বিদ্যুৎ আছে কিনা তা দেখার জন্য একদিন রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়-জলের সময় আকাশে একটা ঘুড়ি ওড়ান। ঘুড়ির সুতোর শেষে তিনি একটা ধাতুর চাবি আটকে দেন। তারপর ঘুড়িটাতে বজ্রপাত হতে তিনি ধাতব চাবিটাতে হাত দিয়ে দেখলেন, চাবিটা শক দিচ্ছে। এর পর তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখলেন কোন বস্তুতে জমে থাকা বিদ্যুৎ মাটির সঙ্গে যুক্ত কোন ধাতব ছুঁচোল দণ্ডের সংস্পর্শে এলে মুক্ত হয়। এই ধাতব ছুঁচোল দণ্ড তিনি বড় বড় বাড়ি, গির্জার মাথায় বসিয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। ফলে বজ্রাঘাতে এইসব বাড়িঘর গির্জা মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত বা আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে গেল অনেক।

"ও, তাই বুঝি, তাহলে মাছ ধরার বজ্র নিরোধক কে তৈরি করেছিল ?"

—গল্প শেষ হতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল জিজা।

আমি বললুম, "তুই বল না।"

"বলবো ?—বাব ফিশার।"

অলয় ঘোষাল

বলতে পারো কেন?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর :

নক্ষত্ররা মিট্‌মিট্‌ করে কেন?

নক্ষত্রদের নিজস্ব আলো থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে ওদের অবস্থান হেতু আমরা ওদের বেশ নিষ্প্রভ দেখি। ওদের ঐ নিষ্প্রভ আলোকরশ্মিকে আবার পৃথিবী পৃষ্ঠে আসতে হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগের বিভিন্ন ঘনত্বের বায়ুস্তরকে ভেদ করে। ফলে ওর প্রতিসরাঙ্কের যেমন পরিবর্তন ঘটছে, তেমনই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা ও জলকণার দ্বারা আলোকরশ্মির কিছু অংশকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হতে হচ্ছে। আর ঐ কারণেই পৃথিবীর দর্শকের চোখে নক্ষত্র থেকে আগত কোন বিশেষ দিক থেকে আলোকের পরিমাণ সবসময় সমান থাকে না। তাই তাদের মিট্‌মিট্‌ করতে দেখা যায়। •

এ মাসের প্রশ্ন :

আমরা যে মাংস খাই, তা হজম হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পাকস্থলীতো একটি মাংসপিণ্ড, সেটি হজম হয়ে যাচ্ছে না কেন?

জানতে চেয়েছে জ্যোৎস্না রঞ্জন সিনহা, 15/2 নাগার্জুন রোড, দুর্গাপুর থেকে।

প্রঃ ডিনামাইট কি এবং কে আবিষ্কার করেন? লক্ষ্মীকান্ত বসু, গোবরা, চণ্ডীতলা, হুগলী।

উঃ তরল বিস্ফোরক পদার্থ—সেগুলি অতি সামান্য কারণে বিস্ফোরণ ঘটায়, সেগুলিকে নিরাপদে ব্যবহার ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়—তাহাই ডিনামাইট। তীব্র বিস্ফোরক এই বস্তুটিকে প্রথম কাইজেলগার নামক ছিদ্রবহুল বেলেমাটির দ্বারা নাইট্রোগ্লিসারিইলে শোষণ করিয়ে প্রস্তুত করেন বিজ্ঞানী নোবেল। পরে তিনি অ্যামোনিয়া ডিনামাইট, জিলাটিন ডিনামাইট প্রভৃতি আরও বহু উচ্চশক্তি সম্পন্ন ডিনামাইট আবিষ্কার করেন।

প্রঃ কে, কবে কাগজ আবিষ্কার করেছেন? মীরকাশিম মণ্ডল, আবদুল আলিম মণ্ডল, মীরন মণ্ডল, গোবিন্দপুর, [illegible], নদীয়া।

উঃ আজকের দিনে আমরা যে সব কাগজ ব্যবহার করি তাদের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে—ইওরোপে যন্ত্রে। কিন্তু কাগজের আবিষ্কার বহু পূর্বের ঘটনা। বলতে হচ্ছে, মানুষ যেদিন লেখার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল সেদিনই পরিকল্পনা করেছিল কাগজের। খ্রীস্টপূর্ব 3000 অব্দে মিশর প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া জাতীয় একরকম গাছের ছালকে কাগজের মত ব্যবহার করতো। প্রসিদ্ধ রোমান ঐতিহাসিক ও প্রথম বিশ্বকোষ প্রণেতা প্লিনির লেখা থেকে জানা যায়, প্যাপিরাস গাছের মোটা অংশটার ফালি কেটে এবং ফালি থেকে ছাল ছাড়িয়ে ছালগুলোকে আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে চাদরের মত করে নিত। এইটিই ছিল আদি কাগজের রূপ। আর ঐ প্যাপিরাস থেকেই পেপার কথাটির প্রচলন। অনেকের মতে খ্রীস্ট জন্মের ঢের আগে চীনারাও কাগজ তৈরি করেছিল। তবে কে, কত সালে যে কাগজ আবিষ্কার করেছেন সে কথা কারও জানা নেই।

প্রঃ লুই পাস্তুর এত আবিষ্কার করেছেন, তবু তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়নি কেন? অশ্রুহরণ মণ্ডল, হাঁসখালি, গোবিন্দপুর, নদীয়া।

উঃ নোবেল পুরস্কার প্রদান শুরু হয়েছে 1901 সাল থেকে। এই পুরস্কারটি আবার জীবদ্দশায় প্রদান করা হয়। কিন্তু লুই পাস্তুর দেহরক্ষা করেছেন 1895 সালে।

প্রঃ কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে মাথা ন্যাড়া করার সংস্কারটা কী কুসংস্কার নয়? আমার দাদুর মৃত্যুতে মাথা ন্যাড়া না করায় আমি তিরস্কৃত হয়েছি। আমি কি ঠিক করিনি? প্রশান্ত কুমার পাল, পঞ্চানন্দপুর, মালদা।

উঃ প্রশান্ত, তোমার সুদীর্ঘ চিঠিতে উত্তর পাওয়ার জন্য বারে বারে অনুরোধ করেছো। এই বিতর্কিত বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়াটাই হচ্ছে, নিজের ব্যক্তিগত মনোভাব ব্যক্ত করা। তবু বলি সংস্কার বলতে সবকিছুকে কুসংস্কারের আওতায় ফেলা যায় না। সব দেশের মানুষের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কার আছে। এবং যে সংস্কারগুলো মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক—সে সংস্কারকে পরিত্যাগ করা

উচিত নয়। যেমন ধর, বাল্যে বিদ্যাভ্যাস করার রীতিটিও সংস্কারে পরিণত হয়েছে। চুরি না করা, মিথ্যা না বলা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদি সংস্কারের কি কোন মূল্য নেই ?

তবে হ্যাঁ যে সংস্কারগুলো মনুষ্যত্বের অবমাননা করে, যা মানুষের অপরাধ প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়, যা কাপুরুষতাকে ডেকে আনে, ইত্যাদি যুক্তিহীন, অন্ধ সংস্কারই কুসংস্কার। যেমন জাতিভেদ, ধর্মের নামে আচারসর্বস্ব চিন্তাধারা ও অনুদার ধর্মমত, চিরাচরিত ধারণাগুলোকে বিচার না করে নির্বিকার চিত্তে মেনে নেওয়া ইত্যাদি। তাই বলি আমাদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কারগুলোকে আজকের বিজ্ঞানের আলোতে ভালোভাবে যাচাই করা উচিত।

এবার তোমার সমস্যার কথায় আসা যাক। মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, আত্মার স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য পুরোহিতের নির্দেশ ইত্যাদি সংস্কারের মূলে যুক্তি বিশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু গুরুজনের মৃত্যুতে এগার দিন ধরে যে শোকপালন এবং শোকচিহ্ন ধারণ স্বরূপ মাথা ন্যাড়া প্রভৃতিকে নিছক একটা কুসংস্কারের আওতায় কেমন করে ফেলবে ? যাঁরা গুরুজন—যাঁরা তোমাদের পরিচর্যার মাধ্যমে এত বড়টি করেছেন, যাঁরা স্নেহ যত্ন এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে তোমাদের দ্বিজত্ব দান করেছেন, তাঁদের মহাপ্রয়াণে তাঁদের বংশধরদের কি শোকপালন উচিত নয় ?

এতো গেল নীতির কথা। এবার যদি বিজ্ঞানের কথায় এসো, তাহলে দেখতে পাবে—মাঝে মাঝে মাথার চুল ফেলে দেওয়া ভাল। ছেলেবেলায় দু এক বছর অন্তর অন্তর মাথা মুড়োলে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং চুলও দীর্ঘস্থায়ী হয়। ঐ প্রচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক সত্যটি যদি সংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে বলা যায়—তাহলে ওকে কুসংস্কারই বলি কেমন করে ? নবজাতকের মাথার চুলকে মহাদেবের কাছে মানত রাখার যে নিয়ম—তার পেছনে কি কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই ?

পরিশেষে বলি, প্রতিটি দেশের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। অন্ধভাবে কোন কিছুকে স্বীকার করে নিতে বলছি না। ভালভাবে যাচাই করে দেখতে হবে। যা ভাল তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং যা অহিতকর তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। সেই সঙ্গে নতুন আলোতে নতুন কিছু কিছুকে গ্রহণও করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে সেটি যেন জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী না হয়।

প্রঃ প্রেত বৈঠক বা প্লানচেট সম্বন্ধে দেশ বিদেশের বহু মনীষী বহু তথ্য পরিবেশন করে গেছেন। সেই তথ্যগুলি কি বিজ্ঞান সম্মত ? (১) সোমা কুণ্ডু, লোকপুর, বাঁকুড়া। (২) প্রতীক চন্দ, নয়াগ্রাম, মেদিনীপুর।

উঃ প্রেতবৈঠক বা প্লানচেট সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন আছে। বছর দেড়েক আগে একবার উত্তরও দেওয়া হয়েছিল। তার পরেও অনেকেই রেখেছেন ঐ একই প্রশ্ন।

সত্য কথা। প্ল্যানচেটে বিশ্বাসীর সংখ্যা পৃথিবীতে কিছু কম নয়। এবং বহু জনে বহু লেখার মধ্যে আপন অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করে গেছেন। তবুও বলি, আর যাই হোক না কেন এটি বিজ্ঞান সম্মত নয়। বিজ্ঞানের কাছে আজও আত্মা, জন্মান্তর, পরলোক ইত্যাদি অন্ধকারে ঢাকা থেকে গেছে। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালিয়েছে বিজ্ঞান তবু বুঝতে পারেনি, যারা যায় তারা কোথায় যায় ?

যে সব মনীষী প্ল্যানচেটের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তাঁরা আত্মা, জন্মান্তর ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। তাঁরা যে সব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন সেসব পরীক্ষা অবলম্বন করে শতকরা একশজন কৃতকার্য হতে পারে না। আর সবাই যখন একই ফল লাভ করতে পারে না, তাহলে সেটি কেমন করে বৈজ্ঞানিক সত্য হবে ? যদি সত্য হতো, তাহলে তুমি আমি সবাই প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। মুষ্টিমেয় দু-চারজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না। যাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন বলে দাবী করেন, সেটি তাঁদের মানসিক বিকার কিনা কে জানে! ও'রা আবার তথ্য প্রতিষ্ঠার দিকে যত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, পরীক্ষার প্রতি ততখানি নিস্পৃহ থেকে গেছেন। বিপদের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন কিন্তু বিপদ থেকে মুক্ত থাকার কোন উপায় বলে দেননি। অতএব তোমরাই এবার বিচার করে দেখ।

প্রঃ আমার দাঁতের মাড়ি থেকে মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। এর প্রতিকার কী ? সোমনাথ সিনহা, 10 স্কুল রোড, দুর্গাপুর-4।

উঃ মনে হয়, তোমার দাঁতের রোগ আছে অথবা ভুল পদ্ধতিতে দাঁতকে ব্রাশ কর। আজকে দাঁতকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বহু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যে কোন দাঁতের রোগকে অল্পায়াসেই সারিয়ে ফেলা যায়। ভাল দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবে, রাতে খাওয়ার পর অবশ্যই দাঁত ব্রাশ করবে, দাঁত ও মাড়ির সংযোগস্থলে টার্টার (কালচে বাদামী রঙের এক ধরনের শক্ত পদার্থ) জমেছে কিনা দেখবে এবং প্রয়োজন হলে দাঁতের স্কেলিং করে আনবে। আজ থেকে সাবধানতা অবলম্বন না করলে ভবিষ্যতে খুব খারাপ হবে।

প্রঃ বৃহস্পতির উপগ্রহ সংখ্যা কত ? তাদের নাম কী ? শুভদীপ বড়ুয়া, 21 মিলন পার্ক, গড়িয়া, কলি-84।

উঃ আজ পর্যন্ত বৃহস্পতির 16টি উপগ্রহের কথা জানা গেছে। সবার নামকরণও হয়নি। ওদের নাম ও বন্ধনীর মধ্যে ব্যাস উল্লেখ করা হল। 1. গ্যানিমিড

[শেষাংশ 65 পৃষ্ঠায়]

মজাদার ফোয়ারা

অপরাজিত বসু

প্রথমে একটা দু'মুখো বোতল (উলফের বোতল) নাও। তার মধ্যে লাল কালি মেশানো জল নাও। দু'মুখের একদিকে একটা বাঁকানো কাচের নল ঢুকিয়ে দাও, কাচের বহিঃপ্রান্ত যেন ছুঁচালো হয়—এটা দেখে নিও। অন্য মুখে একটা সোজা কাচের নল বসিয়ে দাও, কাচের নলের বাইরের দিকটা যেন একটা সচ্ছিদ্র পাত্রের (চিনামাটি অথবা মাটি) মধ্যে ঢোকানো থাকে। সচ্ছিদ্র পাত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে—এর মধ্যে গ্যাস চুঁইয়ে ঢুকতে পারে, অর্থাৎ ব্যাপন সম্ভব। এবারে একটা বড় বিকারে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে (কিপস যন্ত্র থেকে অথবা জিংক / লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে জলের নিম্নাপসারণের সাহায্যে বিকারে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরতে হবে) বিকারটা উল্টে সচ্ছিদ্র পাত্রের উপর ধর। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য কর—রঙিন জল ছুঁচালো নল দিয়ে ফোয়ারার মতো উঠে আসছে। যতক্ষণ বিকার দিয়ে সচ্ছিদ্র পাত্রটি ঢাকা থাকবে ততক্ষণ ফোয়ারার খেলা চলতেই থাকবে। যখন বিকারটি পাত্র থেকে দূরে সরিয়ে দেবে তখন আর ফোয়ারা উঠবে না।

এখন প্রশ্ন কেন ফোয়ারা হয়? সচ্ছিদ্র পাত্রের মধ্যে আছে বাতাস আর বিকারে আছে হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাস বাতাসের তুলনায় হালকা, তাই সচ্ছিদ্র পাত্রের ভিতরে যত তাড়াতাড়ি হাইড্রোজেন গ্যাস ঢোকে তত তাড়াতাড়ি পাত্র থেকে বাতাস বেরিয়ে আসে না। এজন্য সচ্ছিদ্র পাত্রের উপর বিকার চাপিয়ে দিলে পাত্রের ভিতরের গ্যাসের চাপ বেড়ে যায়, অতিরিক্ত চাপ রঙিন জলকে ঠেলে ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে দেয়। বিকার সরিয়ে দিলে চাপ কমে যায়, কারণ তখন পাত্রের ভিতরের হাইড্রোজেন দ্রুত বেরিয়ে আসে, বোতলের গ্যাস-চাপ কমে গিয়ে ফোয়ারা নেমে আসে!

মজাদার ফোয়ারা

[64 পাতার পর]

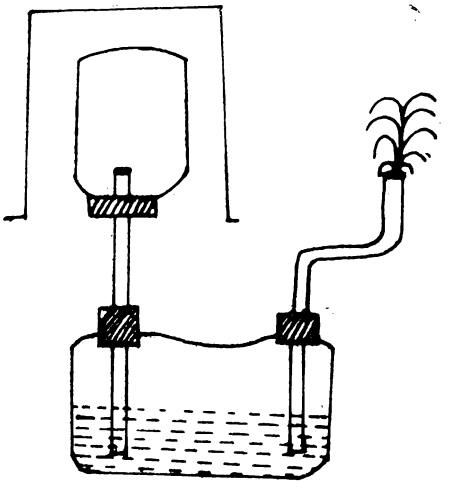

(5276 কি. মি.), 2. ক্যালিস্টো (4820 কি. মি.), 3. ইওরোপা (3050 কি. মি.), 4. আইও (3640 কি. মি.), 5. হিমালিয়া (185 কি. মি.), 6 অ্যামালথিয়া (150 কি.মি.), 7. এলারা (75 কি. মি.) 8. থিবি (75 কি. মি.), 9. প্যাসিপি (50 কি. মি.), 10 কার্মে (40 কি. মি.), 11. সিনোপে (35 কি. মি), 12. লিসিথিয়া ([illegible] কি. মি.), 13. অ্যানাঙ্কে (30 কি. মি.), 14. নেডা ([illegible] কি. মি.), 15. — (40 কি.মি.), 16. — ([illegible]

প্রঃ [illegible]ন্নার কাজে যে হলুদ ব্যবহার করে থাকি সেই হলু[illegible] [illegible] থেকে তুলে কিভাবে খাওয়ার উপযোগী করা হয়? কাঁচ [illegible] [illegible] রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়? স্মৃতিকণা কর্মকার [illegible], বর্ধমান।

উঃ [illegible] থেকে তুলে হলুদকে সেদ্ধ করা হয়। তারপর ছায়া[illegible] [illegible] হয় নরম অবস্থায় গুঁড়ো মাটির সঙ্গে ঘষে ঘষে ভালভাবে গোলগালও করে নেওয়া হয়। আর কাঁচা হলুদকে রান্নার কাজে ব্যবহার করলে হলুদের গন্ধটা প্রকট হয়। তাতে স্বাদ খারাপ হয় তবে ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই।

প্রঃ মঙ্গল গ্রহকে লাল দেখায় কেন? তাছাড়া অন্যান্য গ্রহদের মধ্যে কার কী কী রঙ আছে?

উঃ মঙ্গলের মাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ওতে লোহার অক্সাইডেরই প্রাধান্য। এককালে মঙ্গলের আবহমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। সেই অক্সিজেন মঙ্গল পৃষ্ঠে লোহার সঙ্গে ক্রিয়া করে লাল লাল অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই মঙ্গল পৃষ্ঠ লাল দেখায়।

খালি চোখে অন্যান্য গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতিকে ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং শনিকে নীলাভ দ্যুতি সম্পন্ন দেখায়। দূরবীনে ওদের গায়ে লাল ছোপ দেখা যায়।

হাইভোল্টেজ প্রোটেকশন

নির্মলেন্দুবিকাশ পাত্র

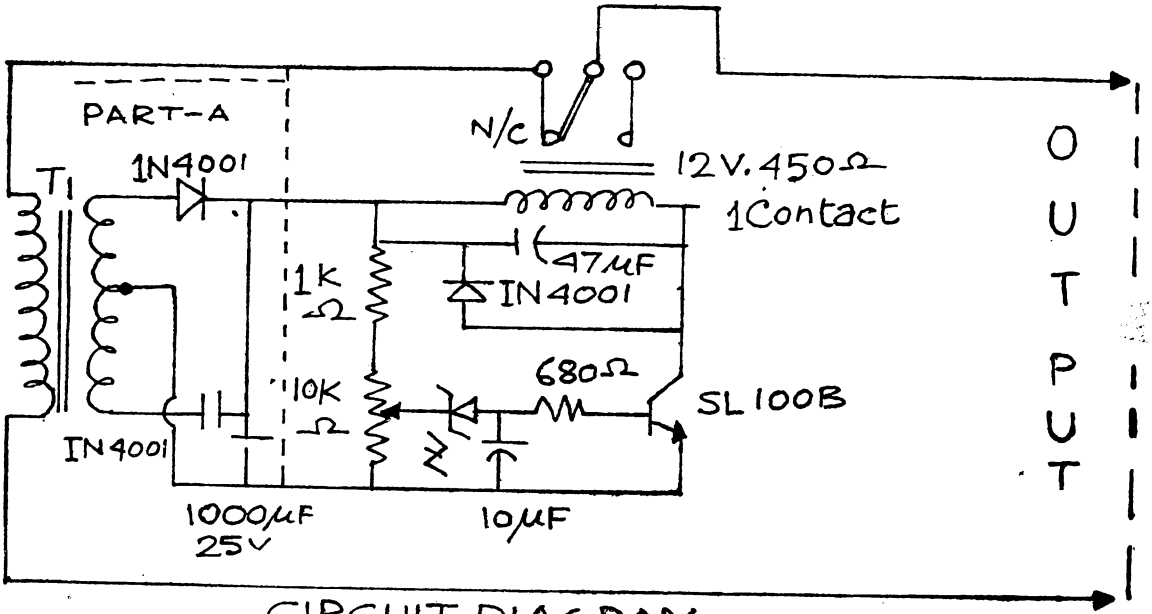

CIRCUIT DIAGRAM

আজ তোমাদের এমন একটা circuit দেখিয়ে দেব যার সাহায্যে সহজেই তোমরা টি. ভি., ফ্রীজ ইত্যাদিকে High Voltage এ নষ্ট হবার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। সার্কিটে কেবলমাত্র একটি এলিমিনেটর এবং একটি ভোল্টেজ অপারেটেজ রীলে রয়েছে। PARFA হল এলিমিনেটর। T একটি 12-0-12v 250mA Secondary, step down centre tapped transformer. ভোল্টেজ অপারেটেড রিলের প্রথমে রয়েছে IKΩ এবং 10KΩ এর সমন্বয়ে তৈরি একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার। এর সাহায্যে মোট ভোল্টেজের একটা ক্ষুদ্র অংশ জেনারডায়োতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জেনার ডায়োড হবে 300 ভোল্টের। 10K. Ω Preset ঘুরিয়ে ভোল্টেজ রেইনজ ঠিক করা সম্ভব। এখন মোট ভোল্টেজ বাড়লেই ট্রানজিস্টারে Base gain high হবে এবং Relay operate হবে। ফলে কানেকশান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সার্কিটের output অংশে তোমরা টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি লাগাতে পারো। লোড কত বেশী দেবে রিলের Contact current ও তত বাড়াতে হবে।

গ্রাম + পোঃ—চামরাইল, জেলা—হাওড়া

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

কিশোর রচনা সঙ্কলন

দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র ও চিঠিপত্র সহ

সম্পাদনা : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ১৫৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮/৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে আগামী 7মে শনিবার মহাবোধি সোসাইটী হলে। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়।

সফল প্রতিযোগীদের ডাকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে। তবে সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে যারা আমন্ত্রণ পত্র পাবে না তাদেরকে অবশ্যই অনুষ্ঠানের দিন হাজির থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে

এছাড়া যোগদানেচ্ছু কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য পাঠক-পাঠিকরাও দপ্তর থেকে আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ করতে পারে যারা অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারবে না তারা চিঠিসহ লোক মারফৎ পুরস্কার বা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারো।

পরিচালক

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

বি. দ্র. ঃ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তদের কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান দপ্তরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সফল উত্তরদাতাদের নাম

মার্চ '88-এর সংখ্যায় প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **সুজন** সাঁতরা প্রযত্নে, আনন্দ গোপাল সাঁতরা 20, কৈলাস নগর পোস্ট—ব্যাণ্ডেল জেলা - হুগলী-712123। 2. **অনুপম সরকার** কাঁটা-পুকুর পোস্ট—মগরা, জেলা—হুগলী। 3. **অঞ্জন কুমার সেনগুপ্ত** প্রযত্নে তাপস কুমার সেনগুপ্ত পোস্ট+গ্রাম—বসিরহাট [আশ্রমপাড়া, নৈহাটি] জেলা—উত্তর 24-পরগনা পিন—743411। 4. **সব্যসাচী ভট্টাচার্য** প্রযত্নে, সমীরনাথ ভট্টাচার্য 19/1, আর. এন. টি.। রোড পোস্ট+গ্রাম—হরিনাভি দক্ষিণ-24-পরগনা। 5. **তন্ময় মহাপাত্র** 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড কলকাতা-700010। 6. **কুন্তল রায়** প্রযত্নে, নলিনীরঞ্জন রায় পোস্ট+গ্রাম —ফতেপুর জেলা—দক্ষিণ-24-পরগনা পিন-743513। 7. **কল্যাণ কান্তি কোলে** প্রযত্নে, রাধাকান্ত কোলে পোস্ট+গ্রাম-বাজে মেলিয়া ভায়া-নালিকুল জেলা-হুগলী। 8. **গৌতম দে** 17/8, রাজা রাজকিষণ স্ট্রীট, কল-700006 9. **অসীম দাস** প্রযত্নে অতুল কৃষ্ণ দাস 17/1/5A, কালীপদ মুখার্জী রোড কলকাতা-700008। 10. **মঞ্জুয়া ঘোষ** প্রযত্নে, পি. এম. ঘোষ 1/1B, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-700054।

বি. দ্র. মুদ্রণ-প্রমাদ বশত মার্চ 88 আই-কিউ-টেস্ট এর 5নং প্রশ্নে তৃতীয় কলামে 39 এর স্থলে 30 ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। এই প্রতিযোগিতায় 5নং প্রশ্নটি ধরা হয় নি।

মার্চ '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **রূপাঞ্জন সাহা** (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, রবীন্দ্রকুমার সাহা কে. জি. এঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট পোস্ট-বিষ্ণুপুর, জেলা-বাঁকুড়া পিন-722122। 2. **সুনীল বরণ দাশ চক্রবর্তী**, (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) (সপ্তম) শ্রেণী) বেলিয়াতোড় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় পোস্ট+গ্রাম-রামহরিপুর জেলা বাঁকুড়া। 3. **তন্ময় মহাপাত্র** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড কলকাতা-700010।

মার্চ '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **সৌমেন ভৌমিক** প্রযত্নে, পঞ্চানন ভৌমিক 102, কালীবাড়ি 1ম গলি পোস্ট—নব ব্যারাকপুর জেলা-24-পরগনা (উঃ)। 2. **অতনু শেঠ** বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডুগলি পোস্ট-বাঁশবেড়িয়া জেলা-হুগলী পিন-712502। 3. **সৈকত বিশ্বাস** প্রযত্নে এইচ. কে. বিশ্বাস A/1, রেলওয়ে কোয়ার্টার্স বালীঘাট পোস্ট-বালী জেলা-হাওড়া পিন-711201।

মার্চ '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ অনিন্দ্য দাস। 24-পরগনা প্রদীপকুমার করণ, শাশ্বত ভট্টাচার্য, চন্দন দেবনাথ, মিটু ঘোষ। হাওড়া ঃ দীপক কুমার বাগ। হুগলী ঃ অঞ্জন শেঠ, দেবাশিস শেঠ, শুভ্রদীপ দাস। বর্ধমান ঃ সিদ্ধার্থ দাস, পুষ্পিতা ভৌমিক, তরুণ তপন গরাই। মেদিনীপুর ঃ পুলিন বিহারী সাউ। বাঁকুড়া ঃ দীনদয়াল মণ্ডল।

মার্চ '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর উত্তর প্রদান আশানুরূপ না হওয়ায় কোনও নাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী বিষয় ঃ সমুদ্র সম্পদ ঃ প্রথম ঃ মলয়েন্দু দিন্দা (মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী) পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পোস্ট-বিবেকানন্দ নগর জেলা-পুরুলিয়া পিন-723147।

দ্বিতীয় ঃ পিণ্টু কুমার শীল (একাদশ শ্রেণী) নারিট ন্যায়রত্ন ইন্সটিটিউটশন প্রযত্নে, মণিলাল শীল পোস্ট + গ্রাম-গাজিপুর জেলা-হাওড়া পিন-711413।

তৃতীয় ঃ ইসমাতারা বেগম (দ্বাদশ শ্রেণী পাণ্ডুয়া শশিভূষণ সাহা উচ্চ-বিদ্যালয় পো-পাণ্ডুয়া জেলা-হুগলী।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল নবম দশম শ্রেণী
বিষয় ঃ মহাকাশ জ্যোতিঃপদার্থ

প্রথম ঃ স্নেহাশিস বসু (দশম শ্রেণী) রাজপুর বিদ্যানিধি হাইস্কুল প্রযত্নে প্রীতিকণা বসু পুলিন বিহারী সরণী রাজপুর পো-রাজপুর জেলা-দঃ 24-পরগনা পিন-743358। **দ্বিতীয় ঃ** তপন কুমার পাহাড়ী (দশম শ্রেণী) ফণীন্দ্রদেব উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রযত্নে, রোহিণীকান্ত পাহাড়ী গ্রাম-দক্ষিণ পাইকবাড় পো:-দঃ ডাউকি, জেলা-মেদিনীপুর পিন-721464। **তৃতীয় ঃ** মিঠু ঘোষ গ্রাম-মাখালিয়া, পো-বাখরাহাট জেলা-24-পরগনা পিন-743377।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল সপ্তম অষ্টম শ্রেণী
বিষয় ঃ ভারতের অরণ্য সম্পদ

প্রথম ঃ সুরজিৎ দে (অষ্টম শ্রেণী) সিলভার জুবলি হাইস্কুল প্রযত্নে, করুণাময় দাস গ্রাম-উটপাথর পো-নিমপুরা জেলা-মেদিনীপুর। **দ্বিতীয় ঃ** বিপাশা হাজরা (অষ্টম শ্রেণী) কাঁথি চন্দ্রমণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রযত্নে, নিশিথ রঞ্জন হাজরা পোঃ-কাঁথি জেলা-মেদিনীপুর। **তৃতীয় ঃ** বিকাশ কুমার মণ্ডল (অষ্টম শ্রেণী) দক্ষিণ চংরাচক সুকান্ত বিদ্যাপীঠ প্রসঙ্গে, বিষ্ণুপদ মণ্ডল পোঃ + গ্রাম-ময়না কলাগোছিয়া জেলা-মেদিনীপুর।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী বিষয় ঃ ফুল

প্রথম ঃ পল্লব কুমার মিশ্র (পঞ্চম শ্রেণী) বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয় পোঃ বরানগর কলকাতা-700034। **দ্বিতীয় ঃ** মধুছন্দা জানা (পঞ্চম শ্রেণী) আর্য বিদ্যাপীঠ প্রযত্নে, করুণাময় দাস, গ্রাম-উটপাথর পো-নিমপুরা জেল মেদিনীপুর। **তৃতীয় ঃ** অমলেন্দু পাল (ষষ্ঠ শ্রেণী) শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দির প্রযত্নে, শ্যামল কুমার পাল পো-ভদ্রেশ্বর জেলা-হুগলী পিন-712124

গল্প প্রতিযোগিতায় ফলাফল একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী ঃ

পুরস্কৃত ঃ কৌশিক রায় প্রযত্নে কমলেশচন্দ্র রায় গ্রাম-নোয়াপাড়া পোঃ-সোনারপুর জেলা-দক্ষিণ 24-পরগনা

গল্প-প্রতিযোগিতার ফলাফল সপ্তম অষ্টম শ্রেণী ঃ

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I II III

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

মে '৪৪ সংখ্যার
ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড 1 **সুধাংশু পাত্রের**
বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

গ্রেড 2 **সমরজিৎ করের**
পরমাণু গবেষণায় ভারত

গ্রেড 3 **রতন মোহন খাঁ**
আরও গণিত ক্যুইজ

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্টগ্রেড—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি .....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স.....শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম .....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

মডেল বানাতে গিয়ে

রাজেশ গিরি

মডেল বানাতে গিয়ে আমরা কণ্ডেন্সার বা ক্যাপাসিটার নিয়ে অনেক সময় অনেক অসুবিধায় পড়ি। এইসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রথমেই আমাদের জানতে হবে ক্যাপাসিটার জিনিসটা কি, একে সার্কিটে ব্যবহার করা হয় কেন, অর্থাৎ এর কাজটা কি এবং একে সার্কিটে কিভাবে লাগাতে হয়।

কণ্ডেন্সারই হল একমাত্র ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ, যা বিদ্যুৎ বা বৈদ্যুতিক চার্জকে ধরে রাখতে পারে এবং প্রয়োজনে সার্কিটকে তা সরবরাহ করতে পারে। কণ্ডেনসার D. C. কারেন্টকে আটকে দেয় কিন্তু A. C. কারেন্টকে যেতে দেয়।

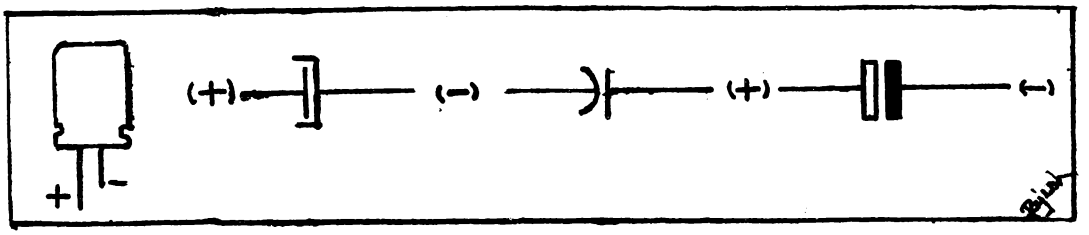

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা কণ্ডেনসারকে ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করি, যেমন—এলিমিনেটরে। এ ক্ষেত্রে ইলেকট্রোলাইটিক কণ্ডেনসার ব্যবহার করা হয়। কণ্ডেনসার চার্জিং ও ডিস্‌চার্জিং-এর দ্বারা D. C.কে ফিল্টার করে। এই সময় কণ্ডেনসার অপ্রয়োজনীয় ও অসুবিধাকর তরঙ্গকে নষ্ট করে এবং হাফ ওয়েভ D. C.কে ফুল ওয়েভ D.C.তে পরিণত করে।

ইলেকট্রোলাইটিক কণ্ডেন্সারের পজিটিভ পয়েন্ট (+) ও নেগেটিভ পয়েন্ট(−) যথাক্রমে সার্কিটের পজিটিভ (+) ও নেগেটিভ (−) লাইনের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। ইলেকট্রোলাইটিক কণ্ডেনসারের গায়ে প্লাস্টিকের আবরণে (+) ও (−) চিহ্নিত করা থাকে। কিন্তু কোন কারণে তা যদি মুছে যায় তবুও তার (+) ও (−) পয়েন্ট চিনতে কোন অসুবিধা হবে না; এই কণ্ডেনসারের দুটি কানেকশন পয়েন্টের একটা তার থাকে বড় ও অপর তারটা হয় ছোট। ঐ বড় তারটা হল (+) ও ছোট তারটা হল (−)।

সার্কিট ডায়াগ্রামে অনেক সময় কণ্ডেনসারের চিহ্নে (+) ও (−) চিহ্নিত করা হয় না, তখন ঐ কণ্ডেনসারের (+) ও (−) পয়েন্ট ঐ চিহ্ন দেখেই বুঝে নিতে হবে। কি রকম চিহ্নে কোন পয়েন্টটা (+) ও কোন পয়েন্টটা (−) হবে তা ছবি দেখে বুঝে নাও। কণ্ডেনসারের গায়ে এর মানের সঙ্গে তা কত ভোল্টেজ অবধি সহ্য করতে পারবে তা লেখা থাকে। ঐ ভোল্টেজের বেশি ভোল্টেজ ঐ কণ্ডেনসারকে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। নন ইলেকট্রোলাইটিক কণ্ডেনসারের কোন (+ ও (−) পয়েন্ট থাকে না। একে যে কোন দিকেই লাগানো যায়। 1 Mfd-এর থেকে কম মানের কণ্ডেনসারগুলি হল নন ইলেকট্রোলাইটিক এবং 1 Mfd ও এর চেয়ে বেশি মানের কণ্ডেনসারগুলি হল ইলেকট্রোলাইটিক।

ঘোড়াধরা, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর—721507

(64 পাতার পর)

পুরস্কৃত ঃ দেবরাজ দত্ত বি বি. 48/4 সেক্টর 1-বিধাননগর কলকাতা পিন-700064।

গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল নবম ও দশম শ্রেণী ঃ

প্রথম ঃ ফেনার রহস্য সংহিতা চৌধুরী (নবম শ্রেণী) দুর্গাপুর এ. ভি. বি হাইস্কুল দুর্গাপুর, বর্ধমান-713206 **দ্বিতীয় ঃ** সাধু বাবার মন্ত্রশক্তি মিঠু ঘোষ (নবম শ্রেণী) বাঘরাহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পো-বাঘারহাট 24-পরগনা 743377। **তৃতীয় ঃ** বন্ধু আমরা সুজাতা চট্টোপাধ্যায় (নবম শ্রেণী) পুরুলিয়া মহেন্দ্র বিদ্যাপীঠ পোঃ-বড় পুরুলিয়া (বর্ধমান)।

গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল একাদশ দ্বাদশ ঃ

প্রথম ঃ সবুজ প্রিজম শিপ্রা পাল (একাদশ শ্রেণী) চাকদহ রামলাল একাডেমী প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল পো-চাকদহ (নেতাজীপার্ক) নদীয়-741222। **দ্বিতীয় ঃ** বাহাদুর বটে কৌশিক রায় (দ্বাদশ শ্রেণী) প্রযত্নে কমলেশ চন্দ্র রায় গ্রাম-নোয়াপাড়া, পোঃ-সোনারপুর দক্ষিণ-24-পরগনা।

1987-88তে প্রকাশিত শব্দকূট প্রতিযোগিতার ফলাফল ঃ

প্রথম ঃ সঞ্জীব কুমার মান্না প্রকাশ কাল সেপ্টেম্বর 1987। **দ্বিতীয় ঃ** সুজন বন্ধু সামন্ত প্রকাশকাল অক্টোবর-নভেম্বর 1987। **তৃতীয় ঃ** রামপ্রসাদ সরদার প্রকাশ কাল জুন-1987।

বিজ্ঞান সমাবেশ

পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবিরে মুর্শিদাবাদ জেলার সাফল্য

গত ফেব্রুয়ারী মাসের 13-17 তারিখে পাটনা শহরে বসেছিল পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির। পূর্ব ভারতের এগারটি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল এতে অংশ নেয়। মুর্শিদাবাদ জেলা অন্যান্য বছরের মত এবারও তার সাফল্য বজায় রেখেছে। জেলার অগ্রণী বিজ্ঞান ক্লাব "মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ" এর সদস্য সৈয়দ রিয়াজ কাদির এবং বহরমপুর মহারানী কাশীশ্বরী গার্লস হাইস্কুলের শ্রীমতী সুস্মিতা ব্যানার্জী জেলার পক্ষ থেকে এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন। এবং উভয়েই বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উক্ত দুজনেই জেলা বিজ্ঞান মেলায় ক্লাব ও স্কুল পর্যায়ে প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন। সৈয়দ রিয়াজ কাদির তাঁর "ডোমেস্টিক সোলার ওয়াটার হিটার উইথ্ অটো ট্র্যাকিং সিস্টেম" মডেলের জন্য দারুণভাবে অভিনন্দিত হন। সুস্মিতা ব্যানার্জীর মডেল ছিল "মিনি স্লাইড প্রোজেক্টর"।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস-1988

বিজ্ঞানকে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া এবং ব্যাপক জনগণ যাতে বিজ্ঞানের সুফল পেতে পারে তার কথা মনে রেখে গতবছর অর্থাৎ 1987 থেকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা হচ্ছে 28শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। এই দিন স্যার সি. ভি. রমন তাঁর বিখ্যাত রমন এফেক্ট বিজ্ঞানী সমাজে প্রকাশ করেন 1928 সালে। এর জন্যই 1930-এ তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

গত বছরের মত এবারও মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন করেছে স্থানীয় শিল্পী মন্দির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। উক্ত স্কুলে সহযোগিতা করেছিলেন—পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ জন বিজ্ঞান পরিষদ--বেথুয়াডহরী ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম ও নেহরু যুবকেন্দ্র ভারত সরকার—মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা।

শ্রীনিবাস রামানুজন—সি. ভি রামন জন্মশতবার্ষিকী

বিশ্ববিশ্রুত গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন ও নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী সি. ভি. রামনের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে কিশোর কল্যাণ পরিষদ আয়োজিত বর্ষব্যাপী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে 3 এপ্রিল হুগলী জেলার রামনগর নুটবিহারী পাল চৌধুরী হাইস্কুলে সারাদিন নানা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান ও বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। রামানুজন ও রামন সম্পর্কে প্রতিযোগিতা আলোচনায় এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তারকেশ্বর হাইস্কুল, তারকেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়, মুক্তারপুর হাইস্কুল, অধরমণি দত্তবিদ্যামন্দির তালপুর পাঠশালা ও রামনগর পাল চৌধুরী হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। এই উপলক্ষে রামানুজন ও রামনের জীবন ও অবদান সম্পর্কে একটি আলোকচিত্র ও পোস্টার প্রদর্শনী আয়োজিত হয় এবং পরিষদের পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেন সভাপতি ডঃ মুখোপাধ্যায়।

দ্বাদশ নিখিল বঙ্গ বিজ্ঞান ও শিল্প শিবির—'৪৪

বিগত 26-28 শে মার্চ 1988 দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের উদ্যোগে দ্বাদশ বিজ্ঞান শিবির অনুষ্ঠিত হয় চন্দননগর হুগলী জেলায় রবীন্দ্র ভবন এবং কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে।

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রসার এবং তরুণদের বিজ্ঞান পিপাসু মনকে সজাগ করাই ছিল এ বছর বিজ্ঞান শিবিরের উদ্দেশ্য।

অভিনব একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী জন সাধারণকে বেশ সজাগ করে তোলে। সাধুবাবার আগুন খাওয়া, গলা কাটা মৃতদেহ শূন্যে ভাসানোর ভেলকীর পেছনে কোন যে অলৌকিক শক্তি কাজ করে না। এগুলো সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মডেলের মধ্যেছিল গোবর ব্যাটারী, প্রস্রাবকে ব্যবহার করে এক ধরনের সার, উন্নত ধরনের হিরে কাটার যন্ত্র, গাছের পাতা থেকে বিদ্যুৎ দিয়ে রেডিও চালানো এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য অক্সিজেন তৈরি করার যন্ত্র প্রভৃতি।

এ বছর বিজ্ঞান শিবিরে দুজন ব্যক্তিকে বিজ্ঞান এর গবেষণা ও বিজ্ঞান প্রসারের জন্য DVC পুরস্কার দেওয়া হয়। তারা হলেন অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরী এবং যুগল কান্তি রায়।

গ্রন্থসূচী : সায়েন্স ক্যুইজ ● গণিত ক্যুইজ ● নলেজ ক্যুইজ ফিজিক্স ক্যুইজ ● কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ● লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

লেখকসূচী : অমরনাথ রায় ● অরূপরতন ভট্টাচার্য ● অলক চক্রবর্তী ● তারকমোহন দাস ও সীমা সেন

ক্যুইজ সেট

প্রকাশিত হয়েছে
৬টি বইয়ের
সেট ৫০.

স্টল নং ৫১০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 7TH YR VOL 9

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন	লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	সায়েন্স ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী	ফিজিক্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	গণিত ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	নলেজ ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ । প্রতিটি ১৫ টাকা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২ দাম : 4·00 টাকা।